সাওযান বিনতে মুস্তফা বুখাইত

"রিফকন বি-আকিদাতী ইয়া উম্মী"-গ্রন্থের অনুবাদ

ফুটিয়ে তুলুন সুবাসিত ফুল

নববি আদর্শে সন্তান প্রতিপালনের রূপরেখা

অনুবাদ ও সংযোজন
মারগুব ইরফান

সম্পাদনা
সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

আয়ান

বইটি কেন পড়বেন?

'কীভাবে শিশু প্রতিপালন করতে হয়' —এই ধরনের চিন্তার সাগরে হাবুডুবু খায় না এমন পিতা-মাতার সংখ্যা খুবই কম। সন্তান জন্ম গ্রহণের পর সকলকেই একটা বিড়ম্বনায় পড়তে হয় যে, কীভাবে সন্তান প্রতিপালন করবো। এমনিভাবে সন্তান কি শুধু প্রতিপালন করলেই হবে?

আদর্শ সন্তান রূপে গড়ে তুলতে হলে পিতা-মাতার ভূমিকা কেমন হবে ?

ইসলামী পরিবেশের মধ্য দিয়ে কীভাবে আপনার সন্তানকে পরিচর্যা করবেন?

এই বইয়ের মধ্যে এসকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আমি কামনা করি, আপনার সন্তান দুনিয়াতে আপনার জন্য হোক চোখের শীতলতা!

আখেরাতের জন্য হোক উত্তম সাদকায়ে জারিয়া!!

ফুটিয়ে তুলুন সুবাসিত ফুল

মূল

সাওয়ান বিনতে মুস্তফা বুখাইত

অনুবাদ ও সংযোজন

মারগুব ইরফান

শিক্ষক, জামিয়া আরাবিয়া আশরাফুল উলুম

মঙ্গলবাড়ীয়া বাজার, কুষ্টিয়া

সম্পাদনা

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

প্রতিটি শিশুই আমার সন্তানতুল্য।
তাদের প্রতি আমার খোলা চিঠি—'তোমরা ফুলের মতো হও।
আজ এবং কালকের পৃথিবী তোমাদের সুবাসে,
কথা ও কাজে, জ্ঞানে ও গুণে উদ্ভাসিত হোক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরিশিষ্ট

অনুবাদকের কথা

আমরা প্রায়শই বলে থাকি—'আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ'। এই কথাটা যত সহজে আমরা বলি, আসলে এর বাস্তবতা অনেকটাই কঠিন। আমরা আমাদের শিশুদেরকে ভবিষ্যতের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য কতটুকু চিন্তা করেছি? কয়টা পরিবারই বা আছে—তারা শিশুদেরকে আগামীর উপযোগী করে গড়ছে। সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করছে। সন্তানকে শিশুকাল থেকে পরিচর্যা করছে? খোঁজ করলে দেখা যাবে এমন পরিবারের সংখ্যা খুবই কম। আমরা আমাদের ক্ষেত-খামার বা গাছ-পালা যতটা গুরুত্বের সাথে পরিচরর্যা করি; আমাদের সন্তানদেরকে এর এক সিকিভাগও পরিচর্যা করি না। যার ফলে—সন্তান ছোট থেকেই অবহেলা আর অনাদরে বেড়ে উঠে। অভদ্রতার জীবন-যাপন করে। মা-বাবার শূন্যতা অনুভব করে সন্তান যখন বড় হতে থাকে, তখন সৃষ্টি হয় পরস্পরের মাঝে দূরত্বের ফল্গুধারা। এরপর সন্তান যখন আরো বড় হতে থাকে, তখন মা-বাবা চায় সন্তানকে একটু কাছে পেতে। কিন্তু তাদের এই চেষ্টা এক পর্যায়ে দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়।

আর আমরা কিছু হলেই সন্তানকে দোষারোপ করি। তার ঘাড়ের উপর বদদু'আর বোঝা চাপিয়ে দেই। এটা কি আদৌ আমাদের জন্য উচিত? আমরা সন্তানকে কতটুকু সময় দেই? কাজের ভীরে সন্তান প্রতিপালন হয়ে গেছে আমাদের কাছে একটি বোঝা।

আজ সমাজের চিত্রটা এমন হয়ে গেছে, অনেক বাবা তো সন্তানকে সময়ই দেয় না। আবার অনেক মা আছে যারা কর্মজীবি হওয়ায় সন্তানকে কাজের বুয়ার হাতে ন্যস্ত করে চলে যায়।

সুস্থ বিবেক দিয়ে একটু ভেবে দেখুন, এই সন্তানের ভবিষ্যত কী হবে? সে কার নিকট থেকে সু-শিক্ষা গ্রহণ করবে? এই সন্তানই তো একদিন মা-বাবার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে। মা-বাবার গলায় ছুরি দিবে।

সন্তানকে সু-সন্তান হিসেবে গড়ে তুলতে হলে—পিতা-মাতাকে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে। তাকে সময় দিতে হবে। তাকে নিয়ে ভাবতে হবে। পিতা-মাতার সঙ্গ সন্তানের হৃদয়-ক্ষেতে পানি সিঞ্চনের কাজ করে। সুসন্তান গড়ার লক্ষ্যে ইসলামিক দিক-নির্দেশনাগুলো খুব গুরুত্ব দিয়ে অনুসরণ করতে হবে। তার প্রত্যেহ অভ্যাসগুলোকে নববী আদর্শে রূপায়ন করতে হবে। আমাদের গ্রাম বাংলায় একটি প্রবাদ আছে:

'কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ,
পাকলে করে ঠাস ঠাস'।

অর্থাৎ ছোটবেলা হলো শেখার সময়। বড় হয়ে গেলে হাজার চেষ্টা করলেও সাধারণত কোন লাভ হয় না।

সুতরাং—ছোট থাকতেই তাকে সু-শিক্ষায় গড়ে তুলতে হবে। পরিশুদ্ধ চিন্তার বীজ তার ভেতরে বপন করতে হবে। কারণ সুস্থ চিন্তা-ধারা চেতনার বিকাশ ঘটায়। জীবন গড়ার উদ্দম-উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা জোগায়। দেখুন, একটা গাছ; প্রথমে বীজ থেকে অঙ্কুর হয়। অঙ্কুর থেকে চারা। চারা থেকে কুঁড়ি। এমনিভাবে কুঁড়ি থেকে গাছ হয়। এরপর সে সুস্বাদু ফল দেয়ার উপযুক্ত হয়। ঠিক তেমনিভাবে একজন মানুষ প্রথমে ভ্রূণ থেকে নবজাতক হয়। নবজাতক থেকে শিশু। শিশু থেকে কিশোর। কিশোর থেকে টগবগে যুবকে পরিণত হয়। তারপর তার থেকে সম্ভাবনাময় অনেক প্রতিভার বিকাশ ঘটে। গাছ যেমন চারটি স্তর পার করে পূর্ণতায় পৌঁছে, তেমনি একজন মানুষও চারটি স্তর অতিবাহিত করে পূর্ণতায় পৌঁছে। শিশুর প্রথম তিন থেকে পাঁচ বছরই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময়ে মা-বাবা শিশুকে যেভাবে গড়ে উঠাবে, শিশু ঠিক সেভাবেই গড়ে উঠবে। কারণ মা-বাবার দোষ-গুণ সন্তানের মধ্যে

অনুপ্রবেশ করে থাকে।

সুতরাং মা-বাবা যদি সন্তানকে ভালো গুণ উপহার দেয় তাহলে সে ভালো গুণই অর্জন করবে। আর মন্দ স্বভাব উপহার দিলে সে সেটাই গ্রহণ করবে।

প্রকৃত সৌভাগ্য তো ঐ পিতা-মাতাই, যার সন্তান দু'হাত তুলে তাদের জন্য দু'আয় বলে—

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

'রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বা ইয়ানী সগীরা'।

> 'হে রব, তাদের উভয়ের প্রতি রহম করুন, যেভাবে তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।'

অর্থাৎ হে আল্লাহ! শিশুকালে আমার পিতা-মাতা আমাকে কোলে পিঠে করে, আদর যত্ন দিয়ে যেভাবে লালন-পালন করেছে, তাদের কবরে সেভাবেই দয়া বর্ষণ করুন।

কমপক্ষে এই দু'আটুকু পেতে হলেও আপনাকে আপনার সন্তানের ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে। হৃদয় থেকে ভালবাসা দিয়ে সন্তানকে মানুষ করতে হবে। এতে দুনিয়াও আপনার জন্য শান্তির নীড় হবে। আখেরাতের সুউচ্চ মর্যাদাও আপনার কপাল স্পর্শ করবে।

আরেকটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে, সন্তানকে খুব বেশি আহ্লাদ দিয়ে বড় না করা। কেননা এটাও তার ধ্বংসের কারণ হতে পারে।

কিভাবে শিশুকে ইসলামি আঙ্গিকে গড়ে তুলতে হবে? পিতা-মাতার জন্য কি কি পন্থা অবলম্বন করতে হবে? এ বিষয়ে লেখিকা সাওয়ান বিনতে মুস্তফা বুখাইত অসাধারণ আলোচনা তুলে ধরেছেন। সে আলোচনাগুলোকে একটি গ্রন্থে রূপ দেয়া হয়েছে। এ গ্রন্থটির মাধ্যমে তিনি জয় করেছেন হাজারো পাঠকের হৃদয়।

তিনি এখানে প্রারম্ভিক কিছু আলোচনা করেছেন। তারপর পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করে শেষ করেছেন। আর শেষে অনুবাদকের পক্ষ থেকে একটি পরিশিষ্ট যুক্ত করা হয়েছে।

আমি অধম সেই বইয়েরই বাংলা ভাষার রূপ দিয়ে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দেয়ার সামান্য প্রয়াস চালিয়েছি। দয়াময় আল্লাহ তাআলার দরবারে আশা করছি, তিনি যেন এই বইটিকে পিতা-মাতার জন্য অমূল্য সম্পদ হিসেবে কবুল করেন। সর্বত্র সমাদৃত করেন। যেভাবে মূল গ্রন্থকে সমাদৃত করেছেন। কবুল করেছেন।

আমার দৃঢ়বিশ্বাস, পাঠকবর্গ বইটিকে যদি শুরু-শেষ অনুসরণ করেন, ইনশাআল্লাহ শিশু প্রতিপালন ও পরিচর্যার ক্ষেত্রে চমৎকার এক দিকনির্দেশনা লাভ করবেন।

মারগুব ইরফান

কাউনিয়া ব্রাঞ্চ রোড, বরিশাল

চোখে দেখা ঘটনা

[১]

আয়িশা প্রতিদিনের ন্যায় আজও কাজে গিয়েছে। আজ সেখানে তার এক খ্রিষ্টান সহকর্মীর সাথে সাক্ষাত হলো। সহকর্মী ইদানিং তাকে ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করে। ইসলাম সম্পর্কে জানতে চায়। এবার সাক্ষাতে তার অন্যতম একটি প্রশ্ন এ ছিল যে, 'ঈসা আলাইহিস সালাম কি আল্লাহ তাআলার ছেলে নন?'

আয়িশা মুচকি হেসে বলল, না, ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার ছেলে নন। কারণ, আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেছেন—

قَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

> 'তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র মহান। তিনি অমুখাপেক্ষী। আসমানসমূহ ও যমিনে যা আছে সব তাঁরই। তোমাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন প্রমাণ নেই। তোমরা কি আল্লাহ তাআলার উপর এমন কিছু বলছো, যা তোমাদের

| জানা নেই।'[১]

[২]

ছয় বছর বয়সী মুহাম্মদ বিদ্যালয় থেকে আসে। ব্যাগটা রেখে ক্লান্তি ভাব নিয়েই তার আম্মুকে হাসির ছলে জিজ্ঞাসা করলো—আম্মু! আমাদের কি এ কথা বলা ঠিক হবে? যে, আল্লাহ তিনজন। আল্লাহ কি একজন নন?

তার আম্মু শংকিত হয়ে কঠোর স্বরে বললো, আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি! তুমি তো দেখছি কুফুরী কথা বলছো? এই চিন্তাধারা কোথা থেকে পেলে? আম্মুর কথা শুনে ছেলেটি ভয়ে চুপ হয়ে গেল।

আম্মু বললো, 'এখনই আমার সামনে থেকে চলে যাও'!

আম্মু উদ্বিগ্ন হয়ে বসে চিন্তা করতে লাগলো আর ভাবতে লাগলো যে, তার সন্তানের এমন কথা বলার কারণ কি

[৩]

চার বছর বয়সী আব্দুল্লাহ তার আম্মুর কাছে গেল। পাশে একটু বসল। ঐ সময় তার আম্মু খাবার পরিবেশন করছিলেন। এমতাবস্থায় শিশু আব্দুল্লাহ প্রশ্ন করে বসলো, 'আম্মু! আল্লাহ তাআলাই কি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন?'

ওর আম্মু এক গাল হেসে উত্তর দিল, হ্যাঁ বাচাধন, তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আবদুল্লাহ পুনরায় জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা, আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন? এ কথা শুনে আব্দুল্লাহর আম্মুর চোখ কপালে উঠে গেল। তখন সে আব্দুল্লাহর দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে বললো, তোমার প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পূর্বে আমি চাচ্ছি যে, তুমি আল্লাহ তাআলার নিকট বিতারিত শাইতান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। আর শোনো, তোমার মস্তিষ্ক থেকে এ ধরনের মন্দ চিন্তা ঝেড়ে ফেলো। এসব ফালতু প্রশ্ন আর করো না। তুমি কি জানো না যে, সাহাবিগণ এ ধরনের মন্দ

[১] সুরা ইউনুসঃ ৬৮।

চিন্তার কারণে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে অভিযোগ করেছিলেন? কেননা এ বিষয়টি তাদেরকে খুব অস্থির ও উদ্বিগ্ন করে রেখেছিল। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন—'তোমাদের কারো নিকট শাইতান এসে বলে, এটা কে সৃষ্টি করেছে? ওটা কে সৃষ্টি করেছে? একপর্যায়ে বলে তোমার প্রতিপালককে কে সৃষ্টি করেছে? যখন তোমাদের কেউ এ পর্যায়ে পৌঁছবে, তখন সে যেন সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং সতর্ক হয়ে যায়।'[২]

এ কথা শোনার পর তৎক্ষণাৎ আবদুল্লাহ বারবার 'আয়ুযুবিল্লাহি মিনাশ—শাইতনির রাজীম' পড়তে লাগলো।

তার আম্মু মৃদু হেসে বলল—আব্বু! এখন ঠিক করেছো। তুমি কি আমাকে সূরা ইখলাস পাঠ করে শুনাবে?

আব্দুল্লাহ পাঠ করল:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

> 'বলো, তিনিই আল্লাহ, এক, অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেয়া হয়নি। আর তাঁর কোন সমকক্ষও নেই।'[৩]

অতঃপর আম্মু বললেন, হে নয়নমণি! আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন। আচ্ছা শোনো, এই সূরা থেকে আমরা শিখলাম যে, আল্লাহ তাআলাই হলেন এক ও অমুখাপেক্ষী। যিনি কোন সন্তান জন্ম দেননি। তাকেও কেউ সৃষ্টি করেনি বা কেউ তাকে প্রসব করেনি। বরং আল্লাহ তাআলাই হলেন সর্বপ্রথম। তার পূর্বে কোন কিছু নেই এবং তিনিই হলেন সর্বশেষ। তার পরেও কোনো কিছু নেই। প্রতিটা মুমিনের উপর এই বিশ্বাস রাখা আবশ্যক। আর শাইতানের জন্য এমন কোন মাধ্যম রেখে

[২] আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ৩১০২।
[৩] সুরা ইখলাস: ১-৪।

দিবে না; যা দ্বারা সে তোমাকে এমন চিন্তায় ফেলে দেয় যে, আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন? কেননা শাইতান চায়, আমরা যেন কুফুরী করে তার সাথে চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকি। আমরা সর্বদা শাইতানের ধোঁকা থেকে আল্লাহ তাআলার নিকট পানাহ চাই!

অতএব, হে বাচাধন! শাইতানের কথায় কান দিবে না। বরং যখনই তোমার অন্তরে এই ধরণের মন্দ চিন্তা উদয় হবে, সাথে সাথে তুমি আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং অন্য কোন বিষয়ে গভীরভাবে মগ্ন হবে।

বাস্তব প্রত্যক্ষকরণ এখানেই শেষ। তবে কথা এখনও শেষ হয়নি। সুতরাং—আমরা দৈনন্দিন জীবনে আমাদের সন্তানদের সাথে এমন খুঁটিনাটি অনেক বিষয় নিয়ে সময় অতিবাহিত করি এবং উক্ত পরিস্থিতিগুলো সামাল দিতে গিয়েও আমাদের মতামত ভিন্ন হয়ে যায়।

পূর্বে যে সকল উদাহরণ নিয়ে আলোচনা হলো—তার সবই হলো আল্লাহ তাআলার সত্তা নিয়ে। এছাড়া আরো বিভিন্ন বিষয় সামনে আসতে পারে।

*প্রথম উদাহরণে আয়িশা তার খ্রিষ্টান সহপাঠীর প্রতি সহমর্মিতা দেখিয়েছে। যেহেতু সে সত্য ধর্ম অন্বেষণের প্রতি আগ্রহী ছিল। তাই আয়িশা উদার মনে তার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। সে তার প্রশ্নকে প্রত্যাখ্যান করেনি। যদিও এ জীবনে তার অভিজ্ঞতার ঝুলি পরিপূর্ণ।

*দ্বিতীয় উদাহরণে মা তার সন্তানের ভ্রান্ত চিন্তার ব্যাপারে খুব আশংকা প্রকাশ করছিল। সে ভুলেই গিয়েছিল যে, তার এই কঁচি খোকা সামান্য জ্ঞান নিয়ে এই জগৎ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলছে। সে নিজ স্রষ্টাকে খুঁজছে। তবে সে তাকে দ্বীনী শিক্ষা দেয়ার পরিবর্তে ভয় দেখিয়ে সতর্ক করেছে।

* তৃতীয় উদাহরণে মা তার সন্তানের সাথে উত্তম আচারণ করেছে এবং সে এমন কাজ করেছে, যা প্রতিটি মায়ের জন্য করা অত্যাবশ্যক। ভালোবাসা দেখিয়ে আদর-সোহাগ করে বিষয়টি তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে। কেননা সে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ হাদিস পূর্ণরূপে

বোধগম্য করেছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ البَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ

> 'প্রতিটি নবজাতকই জন্ম লাভ করে ফিতরাতের (তাওহিদের) উপর। অতঃপর তার মা-বাবা তাকে ইয়াহুদী বা খ্রিষ্টান অথবা অগ্নিপূজারী রূপেড়ে তোলে।'[৪]

ইবনুল কাইয়্যুম জাওযী রাহিমাহুল্লাহু উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন—এর উদ্দেশ্য হলো: 'প্রত্যেক নবজাতক স্রষ্টার ভালোবাসা, প্রভুত্বের স্বীকারোক্তি এবং তাঁর প্রভুর ইবাদতের বিশ্বাস নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং—তাকে যদি এর উপরই রাখা হয় এবং এর বিপরীত কোন কিছু যদি তার সামনে না থাকে, তাহলে সে এর থেকে অন্য দিকে ঝুঁকে পড়বে না।'

অর্থাৎ—আমাদের সন্তানরা হলো, আমাদের কলিজার টুকরা। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তার প্রতি ভালোবাসার প্রকৃতি ও তার প্রভুত্বের স্বীকৃতি এবং সন্তুষ্টচিত্তে তার ইবাদতের প্রতি অনুরাগী করে সৃষ্টি করেছেন।

সুতরাং যদি তাদের স্বভাব-প্রকৃতি নষ্ট করার মতো প্রতিপক্ষ না থাকে তাহলে তারা এর উপরই অবিচল থাকবে এবং অন্য চিন্তা-চেতনা বা অন্য কোন ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হবে না।

[৪] আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ১২৯২।

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের হক

সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার দায়িত্ব সম্পর্কে ইবনুল কাইয়্যুম রাহিমাহুল্লাহু বলেন—একজন আলেম বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম পিতা-মাতাকে তার সন্তানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন। তারপর সন্তানকে জিজ্ঞাসা করবেন তার পিতা-মাতার ব্যাপারে। কেননা সন্তানের উপর পিতা-মাতার যেমন হক রয়েছে ঠিক তেমনই পিতা-মাতার উপরও সন্তানের হক রয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

> 'আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়েছি।'[১]

অনুরূপ আরেক আয়াতে বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

> 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও, যার জ্বালানি হবে

[১] সুরা আনকাবুত: ৮।

> মানুষ এবং পাথর।'[২]

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—'সন্তানদেরকে ইলম শিক্ষার সাথে সাথে আদব-আখলাকও শিক্ষা দাও।'

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

> 'তোমরা আল্লাহ তাআলার ইবাদত কর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না। আর পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করো।'[৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

> 'তোমরা সন্তানদের সাথে ইনসাফ করো।'[৪]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, আল্লাহ তাআলা সন্তানের ব্যাপারে পিতাকে আগে উপদেশ দিয়েছেন। পরে পিতার ব্যাপারে সন্তানকে উপদেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ

> 'তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্রতার ভয়ে হত্যা করো না।'[৫]

অতএব, যে ব্যক্তি সন্তানকে উপকারী জিনিস শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে অবহেলা করলো এবং তাকে তার উপর ছেড়ে দিলো—সে তার প্রতি চরম পর্যায়ের দুর্ব্ব্যবহার করলো। অধিকাংশ সন্তান তার পিতা-মাতার কারণে নষ্ট হয়। তাদেরকে অবহেলা করা এবং দ্বীনের ফরয ও সুন্নত বিধান না শিখানোর কারণেই তারা গোড়া থেকেই নষ্ট হয়ে যায়। ফলে তারা নিজেরাও উপকৃত হতে পারে না এবং পিতা-মাতাও বার্ধক্যে

---

[২] সুরা আত-তাহরিম:৬।
[৩] সুরা নিসা:৩৬।
[৪] সুরা ইসরা:৩১।
[৫] সুনানু আবি দাউদ:: ৩৫৪৪।

উপনীত হয়ে তাদের থেকে কোন উপকার লাভ করতে পারে না।

কথিত আছে, কিছু লোক এক ছেলেকে তার পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার কারণে তিরস্কার করছিলো। তখন সে বললো, আব্বাজান! আমি ছোট থাকা অবস্থায় আপনি আমার প্রতি মন্দ আচরণ করেছিলেন, তাই বড় হয়ে আমি আপনার অবাধ্যতা করছি। আপনি আমাকে শৈশবকালে নষ্ট করেছেন বিধায় আমি আপনাকে বৃদ্ধ কালে নষ্ট করছি।

অতএব হে জননী! আপনার সন্তান ছোট থাকা অবস্থায় ঈমানের উপর পরিচর্যা করার ব্যাপারে গুরুত্ব দিন। অপেক্ষা ত্যাগ করুন। কেননা শিশু মনে ঈমানের চারা রোপন করা বড় হয়ে আকীদা পরিবর্তন হওয়ার তুলনায় অধিক সহজ।

শিশুমনে আকীদা বদ্ধমূল করার গুরুত্ব

মানব জীবনে আকীদা দৃঢ়মূল করার অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। বিশেষকরে ছোট সন্তানদের ব্যাপারে। নিম্নে এর কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো—

১.আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনা এবং এক প্রভু ও ইলাহ মেনে তার ইবাদত করা। তাঁর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রেও তাকে এক ও অদ্বিতীয় জানা। এই বিষয়গুলো তাদের মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করে দেয়া।

২. আল্লাহ তাআলাকে সম্মান করা। আল্লাহ তাআলার মুরাকাবা (ধ্যান) করা এবং তিনি গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে অবগত আছেন তা তাদের উপলব্ধি করতে শিখানো।

৩. শিশুকে শরয়ি বিধি-বিধান, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য প্রস্তুত করা। যেন তারা যে কোন সময় শরিয়ত কর্তৃক নির্দেশিত বিষয় পালন করতে পারে এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে।

৪. ছোট থাকা অবস্থাতেই নববী আদর্শ অনুযায়ী শিশুর অন্তর পরিশুদ্ধ করা।

৫. এক মুসলমানের অন্য মুসলমানের সাথে সম্পর্ক রাখা ও ভিন্ন

আকীদার লোকদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে সেগুলোও শিক্ষা দেয়া।

৬. ফিতনা ও বিপর্যয়ের সময় আল্লাহ তাআলার দ্বীনের উপর অটল থাকা।

৭. মুসলমানদের দেখা-শোনা করার দ্বারা সমাজে উচ্চ মর্যাদা লাভ করার মহত্ত্ব বুঝানো।

শিশু বয়সে ঈমানী পরিচর্যা পেয়ে যারা বড় হয়েছেন

আমরা যদি ইসলামী ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখতে পাবো এমন অনেক বিদ্বান রয়েছেন যারা শিশু বয়সেই কুরআন মুখস্থ করেছেন এবং শরীয়াতের অগাধ জ্ঞান অর্জন করেছেন। বড় হওয়ার পর যা তাদের ভবিষ্যত জীবনকে সমুজ্জ্বল করে দিয়েছে। সর্বপ্রথম তাঁদের পিতা-মাতাই তাদের এ ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্বেই কুরআন শরিফ মুখস্থ করে ফেলেছে এমন লোকদের দৃষ্টান্ত অগণিত।

ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহু বলেন—'আমি সাত বছর বয়সে কুরআন শরিফ মুখস্থ করেছি। আর দশ বছর বয়সে মুয়াত্তা কিতাব মুখস্থ করেছি।'

ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহু এর জীবনীতে উল্লেখ আছে যে, তিনি ছোট বয়সেই কুরআন শরিফ মুখস্থ করেছেন। তারপর হাদিস, ফিকহ ও আরবি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করে অন্যদের থেকে অনেক এগিয়ে যান।

শাইখ মুহাম্মদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহু দশ বছরে পৌঁছার পূর্বেই কুরআন মুখস্থ করেন।

শাইখ মুহাম্মাদ আল-আমিন আশ-শানকেতী রাহিমাহুল্লাহু দশ বছর বয়সে কুরআন মুখস্থ করা সম্পন্ন করেছিলেন। অতঃপর তিনি নিরবিচ্ছিন্নভাবে ইলম অন্বেষণে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তখন তিনি উসমানী

মাসহাফ [১] ও তাজভীদ শাস্ত্র শিখেন এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সনদসহ ইলমুল কিরাতের শিক্ষা লাভ করেন। সংক্ষিপ্তভাবে ফিকহ শাস্ত্রও অধ্যায়ন করেন।

শায়েখ মুহাম্মাদ ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ তার নানা আব্দুর রহমান ইবনু সুলাইমান ইবনু আলে দামেগ এর কাছে কুরআন হিফয করেন।

---

[১] লেখন পদ্ধতি অনুযায়ী কুরআনের মাসহাফ বিভিন্ন প্রকারের। তন্মধ্যে উসমানী মাসহাফ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সন্তান লালন-পালনে সওয়াবের আশা করা

ইহতিসাব অর্থ হলো—নেক কাজের নিয়ত করা এবং এর জন্য যাবতীয় কষ্ট সহ্য করার ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করা। আল্লাহ তাআলার ওয়াদাকৃত সওয়াব লাভের প্রত্যাশা করা।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনুল আছীর রাহিমাহুল্লাহু এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, ইহতিসাবের অর্থ হলো—সওয়াব অন্বেষণের প্রতি সচেষ্ট হওয়া এবং ধৈর্য ও একনিষ্ঠভাবে নিজেকে সঁপে দেয়ার মাধ্যমে তা অর্জন করা অথবা নেক কাজের ধরণ ব্যবহার করা এবং কাঙ্ক্ষিত সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে কাজ শুরু করা।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

'সমস্ত কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে ইহকাল লাভের অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে, তবে তার হিজরত সেই উদ্দেশ্যেই হবে, যে জন্যে সে হিজরত করেছে।'[১]

আপনার কাছে এটা অস্পষ্ট নয় যে, সন্তান লালন-পালন কতটা কষ্টের

[১] আস সুনান, ইমাম তিরমিযি:: ১।

হয়ে থাকে! তবে এটা অসম্ভব কিছু না। সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে সওয়াবের আশা করা এবং আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা চাই। তাহলে আল্লাহ তাআলা তা আপনার জন্য সহজ করে দিবেন। আপনার সহযোগী হবেন। আপনি হবেন অঢেল সওয়াবের অধিকারী। সন্তান লালন-পালন করে সওয়াব পেতে হলে অবশ্যই নিয়তের বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। কারণ এর দ্বারা অন্তরে সর্বদা আল্লাহ তাআলার বিরাজমানতা বিদ্যমান থাকে। নিয়তের প্রতি আগ্রহ কাজকে আল্লাহ তাআলার জন্য একনিষ্ঠ করে দিবে।

কেমন হবে আপনার নিয়ত?

১. আপনার সন্তানের সুদৃঢ় মজবুত একটি ইসলামী পরিচয় থাকতে হবে। যার দ্বারা সে জীবনযুদ্ধ ও নিত্য-নতুন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করবে। সে শক্তিশালী ঈমান ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে।

২. কিয়ামতের দিন আরশের ছায়াতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা সে আল্লাহ তাআলার ইবাদতে প্রতিপালিত হওয়া এক মহান যুবক।

৩. সে হবে মানুষের জন্য একজন পথপ্রদর্শক ও দাঈ। সর্বদা মানুষকে তাওহিদের প্রতি আহ্বান করবে। মানুষকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শরিয়তের দিকে ফিরে আসার জন্য পথপ্রদর্শন করবে।

৪. নিজের মৃত্যুর পর সন্তান হবে আপনার জন্য সাদকায়ে জারিয়া। নেককার সন্তান আমরণ আপনার জন্য দু'আ করতে থাকবে। এছাড়াও আরো অনেক নিয়ত রয়েছে। উপরোক্ত নিয়তগুলো করে সওয়াবের আশা করা সম্ভব।

শিশুমনে ঈমানের বীজ বপন করার স্তরসমূহ

শিশু মনে ঈমানের বীজ বপন করতে হলে অবশ্যই নিজেকে একজন বিশুদ্ধ আকীদাপন্থী, সুদৃঢ় ও বদ্ধপরিকর ঈমানদার হতে হবে। শিশুর অন্তরে আল্লাহ তাআলার একাত্ববাদিতার প্রতি বলিষ্ঠ বিশ্বাস রাখার ও ঈমানের উপর অবিচল থাকার পরিচর্যা করতে হবে। এই পরিচর্যাটা মৌখিকভাবে করার চেয়ে হাতে কলমে করে দেখানো অধিক ফলপ্রসু। ফলে তার অন্তর হবে নিষ্কলুষ পবিত্র এবং আল্লাহ ও রাসূলের ভালোবাসায় হবে সমৃদ্ধ। অন্তর হবে মহাসত্ত্বার নির্দেশ পালনকারী ও নিষিদ্ধ কাজ পরিহারকারী।

এবার আমি শিশুর বয়স হিসেবে পরিচর্যার সাধারণ কিছু দিকনির্দেশনা উল্লেখ করার চেষ্টা করব। যেন এটা বুঝা যায় যে, শিশু মনে কিভাবে ঈমান-আকীদার চারা রোপন করতে হয়। আমি সাধ্যানুযায়ী ধারাবাহিকভাবে দিকনির্দেশনাগুলো নিম্নে উল্লেখ করলাম।

* প্রথমেই আমি তাদেরকে 'ইবাদত' শিক্ষা দেয়ার বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি, যা তাদের আশপাশের চিন্তার মধ্য দিয়েই হবে।

* এরপর ইবাদতের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার অংশগ্রহণের উপর উদ্বুদ্ধ করণের স্তর নিয়ে আলোচনা করব। যেন ঐ ইবাদতটা অভ্যাসগত কাজ

থেকে পৃথক হয়ে তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ হয়ে যায়।

*যখন তারা ধীরে ধীরে বড় হবে তখন তাদের ঐ অভ্যাসগত কাজগুলো ইবাদতে রূপান্তরিত হওয়ার স্তর শুরু হবে। আর তা হবে আকীদা, তাওহিদ, কুরআন ও শরিয়তের অন্যান্য জ্ঞান। যেন সে বুঝে-শুনে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতে পারে।

এই দিকনির্দেশনা থেকে কিভাবে উপকৃত হবেন?

প্রথমত তাকে যে কোন মূল্যেই হোক উক্ত বিষয়গুলোর শিক্ষা দান করবেন। যেন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিশুর গভীর চিন্তা সুসংহত হয়।

দ্বিতীয়ত শিশু জানে না এমন একটি পদ্ধতি নির্বাচন করুন এবং তাকে ঐ পদ্ধতিতে শিখানোর চেষ্টা করুন। এর সাথে নতুন কোন পয়েন্ট যোগ করবেন না। হ্যাঁ, প্রথমটা যদি ভালোভাবে শিখে নিতে পারে তাহলে ভিন্ন কথা।

উপরের পরিচর্যানীতিটি কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত।

১. গর্ভধারণ ও জন্মগ্রহণের প্রাথমিক স্তর।

২. শারীরিক পরিপক্কতা আসার প্রথম দুই বছর।

৩. শৈশবকালের স্তর।

৪. বিদ্যালয় গমনের স্তর।

৫. শিশু মনে ঈমানের পরিচর্যার জন্য প্রস্তাবনা নির্ধারণ করা।

৬. পরিশিষ্ট।

প্রথম পরিচ্ছেদ

গর্ভধারণ ও জন্মগ্রহণের প্রাথমিক স্তর

গর্ভধারণ ও জন্মগ্রহণের প্রাথমিক স্তর

এটা হলো শিশুর আকীদা-বিশ্বাস নষ্ট হওয়ার যতগুলো কারণ আছে সেগুলো থেকে বেঁচে থাকার প্রথম স্তর। এর উপরই শিশুর আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপিত। এই স্তরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো শিশুর প্রতি যথেষ্ট সতর্ক থাকা।

পিতা-মাতা সৎ হলে সন্তানও সৎ হবে

পিতা-মাতা সৎ না হলে সন্তান কখনো সৎ হবে না। অবাধ্য সন্তান পিতা-মাতার নিজ হাতের কামাই। যেমনটি পূর্বসূরীরা বলেছেন। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্য হলো একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও আনুগত্যে বড় করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা চালানো। হালাল সম্পদ উপার্জন ও আমলের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া। যেন সন্তান সৎ হলে এর ফল তারা ভোগ করতে পারে এবং তারাই যেন একমাত্র হতে পারে সন্তানের জন্য উত্তম আদর্শ।

পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

'আর তাদের ভয় করা উচিত, যদি তাদের পশ্চাতে অসহায় সন্তান রেখে যেত, তাহলে তারা তাদের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হত। সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সঠিক কথা বলে।'[১]

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—'মানুষের জন্য সবচেয়ে উত্তম খাবার হলো তার নিজ হাতে উপার্জিত খাবার। আর সন্তান হলো তার উপার্জনের ফসল।'

অনুরূপভাবে জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা সৎ ব্যক্তির সততার কারণে তার সন্তানকে সংশোধন করে দেন। এবং তার সন্তানের সন্তান ও তার চারপাশের লোকদেরও সংশোধন করে দেন। ফলে তারা আল্লাহ তাআলার রহমতর চাদরে আবৃত থাকে যতক্ষণ সে তাদের মাঝে থাকে।'

وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا

> 'তাদের পিতা ছিল সৎ।'[২]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—তাদের পিতা-মাতা সৎ হওয়ার কারণে তাদের দু'জনকে আল্লাহ তাআলার রহমতের চাদরে আবৃত করে রাখা হয়েছিল।

সাইদ ইবনু জুবাইর বলেছেন, 'আমি আমার সন্তানের জন্য বেশি বেশি নামায পড়তাম।' মাখলাদ রাহিমাহুল্লাহু বলেন, হিশাম রাহিমাহুল্লাহু বলেছেন, তার হেফাযতের আশায় (আমি এটা করতাম)।

এতদাসত্ত্বেও আপনি দেখতে পাবেন কিছু সন্তান পিতা-মাতার অবাধ্য

---

[১] সুরা নিসা: ৯।
[২] সুরা কাহফ: ৮২।

হয়, তবে এর সংখ্যা খুব বেশি না। এর পিছনে এমন কোন হেকমত আছে যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না। যেমন, নূহ আলাইহিস সালাম ও তাঁর সন্তানের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা। এটা মূলত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আগত একটি পরীক্ষা। এজন্য পিতা-মাতার উপর কর্তব্য হলো, সর্বদা আল্লাহ তাআলার দিকে মনোনিবেশ করা। তাঁর সামনে নতশির হয়ে থাকা। বেশি বেশি দু'আর গুরুত্ব দেয়া। মানুষের হেদায়েত আল্লাহ ছাড়া আর কারো হাতে নেই। অবশ্য পিতা-মাতার জন্য এতটুকুর অবকাশ রয়েছে যে, তারা আবশ্যকীয় কিছু মাধ্যম গ্রহণ করবে। সন্তানকে শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে বন্ধুসুলভ ও প্রাজ্ঞপূর্ণ আচারণ করবে। প্রতিটা জিনিস হাতে-কলমে বুঝিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে। কারণ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

> 'আপনি যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত দিতে পারেন না বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন। আর হেদায়েতপ্রাপ্তদের ব্যাপারে তিনিই ভালো জানেন।' [৩]

এমনিভাবে আমরা আরো দেখতে পাই যে, কাফের পিতা-মাতার ঘরে নেককার সন্তান। যেমন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তার কাফের পিতা আযরের কোলে বড় হয়েছেন। যিনি কুফুরিকে দ্রঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন।

নেককার জীবনসঙ্গী নির্বাচন করা

সন্তানদের আকীদা পরিশুদ্ধ করার ক্ষেত্রে নেককার জীবনসঙ্গী গ্রহণের অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। এটা দু'জনের মধ্য থেকে একজনের দ্বারা পূর্ণতা পাবে না। বরং উভয়েরই নেককার হতে হবে। জনৈক দার্শনিক

[৩] সুরা কাছাছ: ৫৬।

বলেছেন, নারী-পুরুষ হলো একটি কবিতার দু'টি চরণের মতো। সুতরাং ঐ কবিতার চরণ অসুন্দর, যার এক অংশ মজবুত আরেকাংশ দুর্বল।

তাইতো শরিয়ত দ্বীনদারির ভিত্তিতে জীবনসঙ্গী নির্বাচনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বামী নির্বাচনের ব্যাপারে বলেছেন—

> 'তোমরা যার দ্বীনদারি ও নৈতিক চরিত্রে সন্তুষ্ট আছো, তোমাদের নিকট সেই ব্যক্তি প্রস্তাব দিলে, তার সোথে (তোমাদের পাত্রীদের) বিবাহ দিয়ে দাও। তা যদি না করো পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ ও চরম বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়বে।'[৪]

আর স্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

> 'চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে মেয়েদের বিয়ে করা হবে, তার সম্পদ। তার বংশ মর্যাদা। তার সৌন্দর্য ও তার দ্বীনদারী। সুতরাং তুমি দ্বীনদারীকেই অধিক প্রাধান্য দাও নতুবা তুমি ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।'[৫]

সালাফগণ সুসন্তান গড়নের ব্যাপারে উত্তম স্ত্রী গ্রহণ করার বেশ গুরুত্ব দিতেন। তাই আবুল আসওয়াদ স্বীয় ছেলেদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন—'আমি তোমাদের সাথে সর্বদা উত্তম আচারণ করেছি। তোমাদের শিশুকাল থেকে শুরু করে বড় হওয়ার পরেও উত্তম আচারণ করেছি। এমনকি তোমাদের জন্মের পূর্বেও।'

তার ছেলেরা বলল—'আমাদের জন্মের পূর্বে কিভাবে আপনি আমাদের সাথে উত্তম আচারণ করেছেন?'

তিনি বললেন—'যেসব স্থান তোমাদের কাছে লজ্জাজনক সেখানে আমি তোমাদেরকে রখিনি। আর আমি তোমাদের জন্য এমন 'মা' নির্বাচন

---

[৪] আস সুনান, ইমাম তিরমিযিঃ ১০৮৫।
[৫] আস সুনান, ইমাম তিরমিযিঃ ৪৮০২।

করেছি; যার কারণে তোমরা নিন্দাযোগ্য কখনো হবে না। অর্থাৎ তোমরা যেন কোন মানুষের নিকট লজ্জার কারণ না হও এবং তোমাদের মাও যেন তোমাদের নিকট লজ্জার কারণ না হয়।'

স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সৎ ও নেককার হওয়ার এতো গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও এ অঙ্গনে এমন কিছু উজ্জল দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, দুজনের একজন নেককার হলেই সন্তান নেককার হতে পারে। সন্তান সৎ হওয়ার কারণ কখনো স্ত্রী একাই হয় কখনো স্বামীও একা হতে পারে। আর হ্যাঁ, এর জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে অকৃত্রিম সাহায্য প্রার্থনা ও দীর্ঘ চেষ্টা-মেহনত করতে হবে।

সহবাসের পূর্বে বিসমিল্লাহ পাঠ করা

সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার যিকির করা মুস্তাহাব। বিশেষকরে চাহিদা পূরণ করার সময়। বরকত লাভের জন্য এবং শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

> 'তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে মিলনের পূর্বে যদি বলে

بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

"উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ্‌শাইতনা ওয়া জান্নিবনাশ্‌শাইতনা মা রাযাকতানা'।

> 'অর্থঃ আল্লাহ তাআলার নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে শাইতান থেকে দূরে রাখ এবং আমাদেরকে যা দান করবে তাও শাইতান থেকে দূরে রাখ।'

তাদেরকে এমন সন্তান দান করা হবে, শাইতান যাকে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।"[৬]

হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহু বলেন, কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর সাথে মিলনে

[৬] আস সুনান, ইমাম তিরমিযিঃ ৩০৯৮।

যায় তাহলে সে যেন বলে—

بِسْمِ اللهِ، اللّٰهُمَّ، بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا، وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ نَصِيبًا فِيمَا رَزَقْتَنَا

"উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা বারিক্ লানা ফীমা রাযাক্তানা, ওয়ালা তাজ্আল লিশ্শাইতানি নাসিবান্ ফীমা রাযাক্তানা।"

> 'অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে যা দান করবেন তাতে বরকত দান করুন এবং শয়তানের জন্য কোন অংশ রাখবেন না।'

এ পদ্ধতিতে যদি সে গর্ভবতী হয়, তাহলে সে একজন নেককার সন্তান লাভ করবে। অনুরূপভাবে সহবাসের সময় সওয়াব লাভের প্রতি গুরুত্ব দেয়া। সুতরাং তারা যদি নেককার সন্তান লাভ করে তাহলে তা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় এবং সওয়াব লাভের প্রত্যাশাই হবে। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> "তেমাদের শরীরের সদকা রয়েছে।" অর্থাৎ আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও একটি সদকা। সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদের কেউ তার কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য বৈধ পন্থা অবলম্বন করে এতেও কি তার সওয়াব হবে? তিনি বললেন, তোমরা বলো দেখি, যদি তোমাদের কেউ হারাম পথে নিজের চাহিদা মিটাত বা যেনা করত তাহলে কি তার গুনাহ হতো না? অনুরূপভাবে যখন সে হালাল বা বৈধ পন্থায় চাহিদা মিটাবে তাতে তার সওয়াব হবে।'[৭]

নেককার সন্তান লাভের জন্য দোয়া করা

যে কোনো বিষয়ে মানুষের সফলকাম হওয়ার তাওফিক লাভ করতে হলে দু'আর ভূমিকা সর্বাধিক। এটা সন্তান নেক ও সৎ হওয়ার বড় মাধ্যমও

[৭] মুসান্নাফ ইবনু আবদুর রাজ্জাক, হাদিস নং ১০৪৬৭।

বটে। এর পরিণামে আপনি তাকে খুব বেশি কুরআনের মজলিসে উপস্থিত হতে দেখতে পারবেন। তাছাড়া নবিদের আদর্শও ছিল নিজ সন্তানাদির জন্য দু'আ করা।

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তার রবের নিকট এই বলে দু'আ করছিলেন—

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

> 'হে আমার রব! আমাকে নেককার সন্তান দান করুন!'[৮]

তিনি আরো বলতেন—

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

> 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে আপনার অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধরের মধ্য থেকে আপনার অনুগত জাতি বানান। আর আমাদেরকে আপনার ইবাদতের বিধি-বিধান দেখিয়ে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।'[৯]

যাকারিয়া আলাইহিস সালাম দু'আ করতেন—

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

> 'হে আমার রব! আপনি আমাকে আপনার পক্ষ থেকে আমাকে উত্তম সন্তান দান করুন। নিশ্চয় আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী।'[১০]

অনুরূপ তিনি আরো দু'আ করতেন—

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

---

[৮] সুরা সাফফাত: ১০০।
[৯] সুরা বাকারাহ: ১২৮।
[১০] সুরা আলে ইমরান: ৩৮।

> ‘হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তান দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন।’ [১১]

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যদিও চক্ষু শীতল হওয়াটা সঠিকভাবে বর্ণিত হয়নি তবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যশীল হওয়ার কথা বর্ণিত আছে। এ ধরনের আরো কিছু আয়াত রয়েছে। যেমনঃ

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي

> ‘আপনি আমার বংশধরদের মধ্যে সংশোধন করে দিন।’ [১২]

وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

> ‘আর আমি নিশ্চয় তাকে ও তার সন্তানদেরকে বিতাড়িত শাইতান থেকে আপনার আশ্রয়ে অর্পণ করছি।’[১৩]

وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ

> ‘আর আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন।’[১৪]

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

> ‘হে আমার রব! আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানান এবং আমার বংশদরদের মধ্য থেকেও। হে আমারদের রব, আর আমাদের দু’আ কবুল করুন।’[১৫]

---

[১১] সুরা আল ফুরকানঃ ৭৪।
[১২] সুরা আহকাফঃ ১৫।
[১৩] সুরা আল ইমরানঃ ৩৬।
[১৪] সুরা ইবরাহিমঃ ৩৫।
[১৫] সুরা ইবরাহিমঃ ৪০।

সুতরাং নেক সন্তান প্রার্থনার জন্য বেশি বেশি দু'আ করা থেকে উদাসীনতার ব্যাপারে সতর্ক থাকা আমাদের জন্য অতি আবশ্যক।

কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি গুরুত্ব দান

মানুষের জীবন যাত্রা ও চিন্তা-চেতনা সুগঠনের ক্ষেত্রে কুরআনের বড় একটি প্রভাব রয়েছে। নিঃসন্দেহে সন্তান ভ্রূণ থাকা অবস্থায়ই কুরআনের প্রতি তার একটা ভালোবাসা জন্মায়; যদি তার মা কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি যত্নবান থাকে।

এক শিশু ভ্রূণ থাকা অবস্থায় তার মায়ের আওয়াজ দ্বারা প্রভাবিত হয়। মায়ের কুরআন তিলাওয়াত শুনে শুনে শিশুটির মস্তিষ্ক চাঙ্গা হতে থাকে। রাত দিনের কিছু অংশে মায়ের কণ্ঠে কি এক মনকাড়া কুরআনের সুমধুর আওয়াজ! এমনকি সে তার মায়ের কাছ থেকেই শিখে নেয় বিশুদ্ধ আরবী ভাষা।

(সম্মানিত লেখিকা বলেন) আমার এক বান্ধবী আমাকে বললো, সে একবার সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তার এক পরিচিত বোনের বাসায় গিয়েছেন। তিনি ঐ বোনের মেয়েকে শিষ্টাচার ও চরিত্রের সুউচ্চ শিখরে দেখতে পেলেন। তাই আমার বান্ধবী আশ্চর্য হয়ে তার বান্ধবীকে জিজ্ঞাসা করল, মেয়েটা এত ভদ্র হলো কীভাবে? সে বললো, মেয়ে পেটে থাকাবস্থায় কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি আমি খুব যত্নবান ছিলাম। এটাই তাদেরকে কুরআনের পাখি বানিয়েছে। করেছে উত্তম চরিত্রের অধিকারী।

মাসে কমপক্ষে একবার হলেও কুরআন খতম করা আপনার জন্য উত্তম। কারণ নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তম হওয়ার ব্যাপারে বলেছন—'এর চেয়ে বেশি যেন না হয়।'

আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি কুরআন কতটুকু পড়বো? তিনি বললেন, এক মাসে খতম করো।[১৬]

[১৬] আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ২৯৪৬।

ভূমিষ্ট সন্তানের জন্য শাইতান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'এমন কোন আদম সন্তান নেই যাকে জন্মের সময় শাইতান স্পর্শ করে না। জন্মের সময় শাইতান স্পর্শের কারণেই সে চিৎকার করে কাঁদে। তবে মারয়াম এবং তাঁর ছেলে (ঈসা আ.) এর ব্যতিক্রম।'

এ জন্য সন্তান জন্ম গ্রহণের সময় বিতারিত শাইতান থেকে প্রার্থনা করা আবশ্যক। যেমনটি ইমরানের স্ত্রী করেছেন যখন তাকে মারয়ামের মতো একজন সতী নারী দান করা হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

> 'আর আমি তার নাম রেখেছি মারয়াম এবং আমি নিশ্চয় তাকে ও তার সন্তানদেরকে বিতারিত শাইতান থেকে আপনার আশ্রয় দিচ্ছি।' [১৭]

এ দু'আ পাঠ করার বিনিময়ে মারয়াম ও তাঁর সন্তানাদি নেককার হওয়ার বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। আল্লাহ তাকে সুন্দরতম পদ্ধতিতে কবুল করেছেন এবং তাকে উত্তমরূপে প্রবৃদ্ধি দান করেছেন।

---

[১৭] সূরা আল ইমরান: ৩৬।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম দুই বছর

প্রথম দুই বছর

শৈশবের প্রথম দুই বছরই হলো সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়ে তার ভিতরে শুদ্ধ চরিত্রের বীজ বপন, ইসলামী মূল্যবোধ সৃষ্টি ও জীবন বিনির্মাণের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দেয়া। এই স্তরে শিশু আপনার নড়াচড়া, ওঠা-বসার প্রতি খুব লক্ষ্য রাখবে। প্রথম বছরে তার অনুভূতিশক্তি জাগ্রত হবে না। দ্বিতীয় বছরের বেশ কিছু দিন পরই তার কথা-বার্তা ও কাজে-কর্মে সেগুলো প্রকাশ পেতে থাকবে। এ জন্য আল্লাহ তাআলার যিকির ও ইবাদতের জন্য দৈনন্দিনের রুটিন তৈরী করা। যেন শিশু এর উপর অভ্যস্ত হয়। আপনার থেকে দৈনন্দিন কিছু কিছু শুনে মুখস্থ করে নিতে পারে। তখন এটা তার প্রত্যহ জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হবে। এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

'তোমরা তোমাদের সন্তানদের নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হও। এবং তাদেরকে ভালো কাজে অভ্যস্ত কর। কেননা ভালো কাজ স্বভাবজাত একটি বিষয়।'

সন্তানদের জন্য বেশি বেশি দু'আ করা

সন্তানের জীবন গঠন ও তাদের সুন্দর পরিচর্যার জন্য দু'আর গুরুত্ব অপরিসীম। পরিচর্যা হবে দীর্ঘ মেয়াদী। কয়েক বছর ব্যাপী। এর জন্য

মায়ের অনেক ধৈর্য ধারণ করতে হয়। বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হয়। শিশু লালন-পালনের ক্ষেত্রে আপনার অগ্রগামী হওয়া এবং আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে দু'আই হবে আপনার একমাত্র কার্যকরী সম্বল। সুতরাং আপনি দু'আর মাধ্যমে আপনার সন্তানের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে হেদায়েত প্রার্থনা করতে থাকবেন। কারণ সন্তান নেককার হওয়া এটা তো সম্পূর্ণ আল্লাহ তাআলার হাতে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

> 'আপনি যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত দিতে পারেন না বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন। আর হেদায়েতপ্রাপ্তদের ব্যাপারে তিনিই ভালো জানেন।' [১]

অতএব হে প্রিয় মা! আপনার কর্তব্য হলো সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আল্লাহ প্রদত্ত মাধ্যমগুলো গ্রহণের প্রতি গুরুত্ব দেয়া। এরপর দুনিয়াবী মাধ্যম গ্রহণ করা। সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সাড়া প্রদানের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

> 'আর যখন আমার বান্দাগণ আপনাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, আমি তো নিশ্চয় তাদের নিকটবর্তী। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই যখন সে আমাকে ডাকে।' [২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্যতম একটি আদর্শ হলো তিনি শিশুদের জন্য খুব বেশি দু'আ করতেন, ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

---

[১] সুরা কাসাস: ৫৬।
[২] সুরা বাকারাহ: ১৮৬।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার জন্য দু'বার দু'আ করেছেন, যেন আল্লাহ তাআলা আমাকে হেকমত তথা প্রজ্ঞা দান করেন।

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তার সন্তানের জন্য দুয়া করেছিলেন—

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء

> 'হে আমার রব! আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানান এবং আমার বংশদরদের মধ্য থেকেও। হে আমারদের রব, আর আমাদের দু'আ কবুল করুন।' [৩]

এক বোন ও তার সন্তানদের গল্প

এক বোন সাদাসিধে এক মহিলার সাথে বসা ছিল। ঐ মহিলার দ্বীন সম্বন্ধে অল্প-স্বল্প জানা-শোনা ছিল। মহিলাটি ঐ বোনের কাছে তার সন্তানদের কথা বলতে লাগলেন। তিনি বললেন, যখনই নমাযের সময় হয়, তার সন্তানগুলো কোনোরকম ডাক দেয়া ছাড়াই নামাযে দাঁড়িয়ে যায়। তখন ঐ বোন বললো, 'মাশাআল্লাহ! কিছু বলা ছাড়াই আপনার সন্তানরা নিজ আগ্রহে নামায আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে যায় এটা কিভাবে সম্ভব? মহিলাটি বললেন, তোমাকে বলার মতো আমার কিছুই নেই। তবে আমি বিবাহেরে আগ থেকে এমনকি আজকের এই দিন পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার কাছে ইবরাহিম নবির এই দু'আ পাঠ করতাম। দু'আটি হলো—

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

> 'হে আমার রব! আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানান এবং আমার বংশদরদের মধ্য থেকেও। হে আমারদের রব, আর আমাদের দু'আ কবুল করুন।' [৪]

---

[৩] সুরা ইবরাহিম: ৪০।
[৪] সুরা ইবরাহিম:৪০।

আরো কিছু দু'আ

এ ধরণের অনেক দু'আ রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হলো।

وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي

'আপনি আমার বংশধরদেরকে সংশোধন করে দিন।'[৫]

وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

'আর আমি নিশ্চয় তাকে ও তার সন্তানদেরকে বিতাড়িত শাইতান থেকে আপনার আশ্রয়ে অর্পন করছি।' [৬]

وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ

আর আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন।[৭]

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

'হে আমার রব! আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানান এবং আমার বংশদরদের মধ্য থেকেও। হে আমারদের রব, আর আমাদের দু'আ কবুল করুন।' [৮]

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

'হে আমাদের রব! আমাদেরকে আপনার অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধরদেরকে আপনার অনুগত জাতি বানান। আর

---

[৫] সূরা আহকাফ: ১৫।
[৬] সূরা আল ইমরান: ৩৬।
[৭] সূরা ইবরাহিম: ৩৫।
[৮] সূরা ইবরাহিম: ৪০।

> আমাদেরকে আপনার ইবাদতের বিধি-বিধান দেখিয়ে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৯]

এ ছাড়া আপনি নিজেও এ বলে দোয়া করতে পারেন, 'হে রব! আমার সন্তানদের শিষ্টাচার শিক্ষা দিন। কারণ আমি উত্তম শিষ্টাচার করতে জানি না। হে আমার রব! আপনি তাদের নেক কাজ আমাকে দান করুন। এবং তাদেরকে সুন্দর মৃত্যু দান করুন। তাদেরকে আপনার দ্বীনী কাজে ব্যবহার করুন। তাদের অন্তরকে পরিবর্তন করবেন না। হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে কুরআনওয়ালা বানিয়ে দিন। তাদের চরিত্র মাধুরী কুরআনের রঙে রঙিয়ে দিন।'

উত্তম নমুনা

এখানে 'উত্তম নমুনা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পিতা-মাতা। তারাই হলেন সন্তানের প্রথম অনুসরণীয় ব্যক্তি। অন্য লোকের তুলনায় পিতা-মাতার গুণের প্রভাবে সন্তানেরা বেশি প্রভাবিত হয়। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন—'আমার মা বুঝ হওয়ার পর থেকেই সোমবার আর বৃহাস্পতিবারে রোযা রাখতেন।'

ফুযাইল ইবনু আয়ায রাহিমাহুল্লাহু বলেন, মালেক ইবনু দিনার রাহিমাহুল্লাহু এক লোককে নামায নষ্ট করতে দেখে বললেন, 'তার পরিবারের উপর আল্লাহ রহম করুন!' তখন তাকে বলা হলো, হে আবু ইয়াহইয়া! এ লোক তার নামায নষ্ট করছে আর আপনি তার পরিবারের জন্য রহমের দু'আ করলেন? তিনি বললেন, সে তাদের অনুকরণীয়। তারা তার থেকেই শিখবে।

আমরা এমন একটা সময় পাড় করছি, যে সময় অনেক পিতা-মাতাই শরয়ি জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ। তবে আল্লাহ যাদের উপর রহম করেন তারা

[৯] সুরা বাকারাহ: ১২৮।

ব্যতীত। এই শ্রেণীর লোক সন্তানদেরকে শিক্ষকের কাছে পাঠিয়েই ক্ষান্ত হয়ে আছে। আর তৃপ্তির ঢেকুর তুলছে এ আশায় যে, তারা সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে বড় কিছু বানিয়ে আমাদের মাঝে ফিরিয়ে দিবেন।

এরপর যখন শিক্ষাকাল শেষ করে সন্তানরা ঘরে ফিরে, তখন তারা দেখতে পায়; তাদের সন্তানেরা শিক্ষক থেকে যা জেনেছে, বাস্তবে করছে তার উল্টো। তারা ঘরে বসে অহরহ ভুল কাজ করেও পিতা-মাতার কাছ থেকেও পাচ্ছে না কোনো দিকনির্দেশনা। আবার অনেক সময় সন্তানদের ভুল কাজ করতে দেখে পিতা-মাতা সংশোধন করতে অগ্রসর হয় তখন সন্তানেরা এই বলে তার নির্দেশনা উপেক্ষা করে যে, আপনারা নিজেরা যা করেন না, তা কেন আমাদের করতে বলেন?

অতএব পিতা-মাতার এই বিষয়গুলোর দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া উচিত। বিশেষকরে মায়ের শরয়ি জ্ঞান থাকা জরুরী। যেন তারা তাদের সন্তানদের জন্য কল্যাণকামী ও উত্তম আদর্শ হতে পারেন। এছাড়াও তারা হলেন সন্তানদের সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তি। তাদের প্রভাবটাই সন্তানের উপর গভীরভাবে কাজ করে। সন্তান যখন ভুল করবে মা তাকে নববী আদর্শ ও শরয়ি দলিল দ্বারা তার ভুল শুধরিয়ে দিবেন। তাহলে এটা হবে প্রমাণ ভিত্তিক একটি সংশোধন। এবং অবস্থান রক্ষাকারী একটি উপলব্ধি। সন্তানের সংশোধনের এই পদ্ধতিটাও হবে নববী মানহাজের অনুকরণ।

মা যদি অশিক্ষিত হন, সন্তান জন্ম দেয়ার আগেই উত্তম হলো দ্বীনি বিষয়গুলো শিখে নেয়া। যেন তিনি শিক্ষিত, দিকনির্দেশক ও আদর্শবান মা হতে পারেন। তিনি যা কিছু শিখবেন তা যেন তাদেরকে শিখাতে পারেন এবং উভয়ে একসাথে একই পথে চলতে পারেন। কেননা সন্তান পিতা-মাতাকে যা করতে দেখে তা-ই অনুসরণ করে। পিতা-মাতার কোন অবহেলা দেখতে পেলে সাথে সাথে সতর্ক হয়ে যায়। এক বোন এরূপ এক বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'তার প্রত্যেক নামাযের পর দু'আ-দরূদ পাঠ করার জন্য কিছু সময় বসার অভ্যাস ছিল। একদিন দু'আ না পড়েই নামাযের পর উঠে গেল। তখন তার ছেলে শিশুসুলভ

ভাষায় এই বলে অপেক্ষা করলোঃ আম্মি! 'আস্তাগফিরুল্লাহ' বললেন না যে!

অতএব, পিতা-মাতার কর্তব্য হলো নিজেদের দ্বীনদারী ও চরিত্র গঠনের প্রতি গুরুত্ব দেয়া। এবং এসব কিছু একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য করা। যেন এগুলো সন্তানের আচার-ব্যবহার ও চরিত্রের মাঝে ফুটে ওঠে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার বাণী—

وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا

> 'আর তাদের পিতা ছিল সৎ।'[১০]

অবুঝ শিশুর এক আশ্চর্যজনক যোগ্যতা হলো তার আশপাশে যা কিছু ঘটে তা সবই সে কুড়িয়ে নেয় এবং স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করে রাখে। চাই সে এর অর্থ বুঝুক কিংবা না বুঝুক!

আবদ ইবনু আবী বকরাহ রাহিমাহুল্লাহু বলেন, 'আমি আমার পিতাকে বললাম, আব্বু! আপনাকে প্রতিদিন সকালে কিছু বলতে শুনি? আপনি সকাল-সন্ধ্যা তিনবার করে বলেন। তখন তিনি বললেন, বেটা! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এই দু'আগুলো বলতে শুনেছি। তাই আমি তার এই সুন্নাতটির অনুসরণ করতে পছন্দ করি।

কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত

এখানে আমরা আরেকটি স্তরের কথা উল্লেখ করব। আর তা হলো, কুরআনের প্রতি শিশুর ভালোবাসা তৈরী করা। এর মোক্ষম সময় হলো সে যখন ভ্রূণ অবস্থায় থাকে, তখন কুরআন শরিফ বেশি বেশি তিলাওয়াত করা। তাহলে সে শুরু থেকেই কুরআন শ্রবণের প্রতি অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। এতে করে আল্লাহ তাআলার কালামের সাথে তার অন্তরঙ্গতা তৈরী হবে এবং আপন রবের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে। পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় কুরআন মুখস্থ করা তার জন্য সহজ থেকে সহজতর হয়ে যাবে।

---

[১০] সূরা কাহাফ: ৮২।

সকাল-সন্ধ্যা শাইতান থেকে আশ্রয় চাওয়া

শাইতান থেকে আশ্রয় চাওয়া হলো সন্তানদের সুরক্ষা করার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়মিত হাসান-হুসাইনের সাথে করতেন, ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসান-হুসাইনের জন্য শাইতান থেকে পানাহ চাইতেন এই বলে—

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

'আয়ুযুবি কালিমাতিল্লাহিত তাম্মাহ, মিন কুল্লি শাইত্বনিন ওয়া হাম্মাহ, ওয়া মিন কুল্লি আইনিন লাম্মাহ'।

> এরপর তিনি বলেন, তোমাদের পিতা এ দু'টি বাক্য দ্বারা ইসমাইল ও ইসহাক এর জন্য পানাহ চাইতেন।[১১]

অতএব পিতা-মাতার জন্য আবশ্যক হলো, সর্বদা সন্তানদের রুকাইয়্যার প্রতি গুরুত্ব দেয়া। বদ-নজর, হিংসা ও পিতা-মাতার অবহেলার কারণে সন্তানদের কত দুর্ঘটনাই ঘটে!

আল-আযকার বা দু'আ

শিশু এ স্তরে পৌঁছানোর পর তার জন্য মাসনূন দু'আ চর্চার একটি রুটিন তৈরী করা। এতে সে আমলের উপর অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। প্রতিটি দু'আর জন্য থাকবে নির্দিষ্ট একটি সময়। এতে দু'আগুলো মুখস্থ করা তার পক্ষে সহজ হয়ে যাবে। সবচে উত্তম পদ্ধতি হলো মা-বাবার মুখ থেকে তারা শোনবে এবং তাদের সামনে দৈনন্দিন দু'আগুলো পুনরাবৃত্তি করা। আপনি আশ্চর্যবোধ করবেন যখন দেখবেন, আপনার শিশু অল্প বয়স হওয়া সত্ত্বেও যখন সে ভালভাবে কথাও বলতে পারছেনা, অথচ ঐ দু'আগুলো

---

[১১] আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ৩৩৭১।

মুখস্থ করে ফেলেছে। বার বার দু'আগুলো সে একা একাই মুখে আওড়নোর চেষ্টা করছে। এর কিছু পদ্ধতি নিম্নে তুলে ধরা হলো:

জাগ্রত হওয়ার সময় নবিজি যে দু'আ পাঠ করতেন

সকাল-সন্ধ্যা শিশুর পার্শ্বে শয্যাসঙ্গী হওয়া এবং তার কানে ঐ দু'আগুলো বারবার পাঠ করে শুনানো। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন তখন এই দু'আ পাঠ করতেন—

الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَحْيانا بَعْدَ مَا أَمَاتَهَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

> 'আলহামদু লিল্লাহিল্লাজী আহইয়ানা বা'দামা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর।'[১২]

আর ঘুমুতে যাওয়ার সময় বলা—

اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا

> 'আল্লাহুম্মা বিসমিকা আমূতু ওয়া আহইয়া।'[১৩]

পানাহারের পূর্বে নবিজি যে দু'আ পড়তেন

পানাহারের পূর্বে (দুধ পান করার পূর্বে) দু'আ পড়া। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ খাবার খায় সে যেন 'বিসমিল্লাহ' বলে নেয়। যদি শুরুতে পড়তে ভুলে যায় তাহলে মনে হওয়ার সাথে সাথে যেন বলে, 'বিসমিল্লাহি আউওয়ালাহু ওয়া আখিরাহ।'[১৪]

খাবারের পর নবিজি যে দু'আ পড়তেন

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাবারের পর বলতেন—

الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ

[১২] আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ৬৩১২।
[১৩] আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ৬৩১৪।
[১৪] আবু দাউদ, হাদিস নং ৩৭৬৭।

> ‘আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আত্বআমানী ওয়া রাযাকানী মিন গায়রে হাওলিম্ মিন্নী ওয়ালা কুওয়াহ’।[১৫]

হাঁচি দিয়ে যে দু'আ পড়বে

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাঁচির ব্যাপারে বলেন; তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দেয় সে যেন বলে, ‘আলহামদুলিল্লাহ’। আর তার অপর ভাই বা সঙ্গী (যে হাঁচির আওয়াজ শুনেছে সে) যেন বলে ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’। অতঃপর ইয়ারহামুকাল্লাহ-র জবাবে হাঁচিদাতা বলবে, ‘ইয়াহদীকুমুল্লাহু ওয়া ই্উসলিহু বালাকুম’।[১৬]

কি চমৎকার কথা! হাঁচিদাতা ‘আলহামদুলিল্লাহ বলবে, উত্তরদাতা বলবে ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’, হাঁচিদাতা এর উত্তরে ‘ইয়াহদীকুমুল্লাহু ওয়া ই্উসলিহু বালাকুম’। কেননা এগুলোই শিশুমনে গেঁথে যাবে। শুধু কি তাই! বরং ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলাই তো যথেষ্ট। সময়ের পালাক্রমে আপনার সন্তান আপনাদেরকে দেখে দেখে শিখে নিবে। রপ্ত করে ফেলবে আপনাদের মুখে শুনে শুনে।

আরোগ্য লাভের দু'আ

সন্তানের শরীরের ব্যথাযুক্ত স্থানে মা-বাবার হাতের ছোঁয়া সত্যিই এক চমৎকার অনুভূতি। এর দ্বারা সে নিজেকে তাদের নিকটবর্তী মনে করবে। অনুভব করবে মমতা ও নিরাপত্তা। সাথে সাথে তার আরোগ্য লাভের দু'আ করা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি যদি তার এমন কোনো মুসলিম ভাইকে রোগাক্রান্ত অবস্থায় দেখতে যায়, যার মৃত্যুক্ষণ আসেনি, সে তাকে সাত বার এই দুয়া করলে—

أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ

[১৫] আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ৩৪৫৮।
[১৬] আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ৬২২৪।

"উচ্চারণ: আস্ আলুল্লাহাল আযীম, রাব্বাল আর্শিল্ আযীম্ আইইয়াশিফয়াক।" [১৭]

> 'আমি মহান আরশের রব মহামহিম আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ প্রার্থনা করছি, তিনি তোমাকে রোগ হতে সুস্থতা দান করুন'; তাকে রোগ মুক্ত করা হবে।

আযান শ্রবণের সময় দু'আ

মুআযযিনের সাথে সাথে আযানের শব্দগুলো পুনরাবৃত্তি করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এতে তার মন-মনন সতর্ক হয়। কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মুআযযিন আযানের মধ্যে যা বলে, শ্রোতাও তাই বলবে। তবে 'হাইয়া আলাস সালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ' এর ক্ষেত্রে বলবে, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'।[১৮]

আযান শ্রবণের পর দু'আ

আযান শেষ হওয়ার পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য দু'আ করা।

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

'আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ্দাওয়াতিৎ তাম্মাহ, ওয়াসসালাতিল কায়েমাহ, আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাদীলাহ, ওয়াব আ'সহু মাকামাম্মাহমূদানিল্লাযী ওয়াদতাহ' ।[১৯]

তারপর এমন দু'আ করা, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা সকল সমস্যার সমাধান করে দেন। প্রথমে নিজের জন্য দু'আ করা। তারপর পরিবার ও

---

[১৭] আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ২০৮৩।
[১৮] মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা, হাদিস নং ২৩৬০।
[১৯] আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ৪৭১৯।

সাধারণ মুসলমানের জন্য দু'আ করা। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি সাহাবাদেরকে বলেছেন—'আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী দু'আ কখনো ফিরিয়ে দেয়া হয় না।'

তখন সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তখন আমরা কি বলবো?

তিনি উত্তরে বললেন, 'তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের মুক্তি কামনা কর।'

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দু'আ

আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন কেউ ঘর থেকে বের হয় সে যেন বলে—

بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

"উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।"

তখন তাকে বলা হয়, আল্লাহ তাআলাই তোমার জন্য যথেষ্ট। তুমি পথ পেয়েছো, রক্ষা পেয়েছো ও নিরাপত্তা লাভ করেছো। অতঃপর এক শাইতান অন্য এক শাইতান কে বলে, তুমি ঐ ব্যক্তিকে কি করতে পারবে যাকে পথ দেখানো হয়েছে। নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে এবং রক্ষা করা হয়েছে।[২০]

প্রতি বার উচ্চ স্বরে হলেও মাসনূন দু'আগুলো তার সামনে পাঠ করা। কারণ এরূপ শ্রবণের ফলে দু'আটি তার স্মৃতিপটে গেঁথে যাবে।

এক বোন বলেন, তিনি নিজে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এবং গাড়িতে আরোহণের সময় এ দু'আগুলো নিয়মিত পাঠ করতেন। যেন তার

---

[২০] আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ৩৫৭৪।

সন্তানরা এগুলো মুখস্থ করে নেয়। কোন একদিন সে দেখলো তার সন্তান আড়াই বছর পূর্ণ না হতেই এ দু'আগুলো পরিপূর্ণরূপে বলতে পারে। অধিক পরিমাণে শোনার কারণে সে মুখস্থ করে নিয়েছে। অথচ এক সপ্তাহও অতিবাহিত হয়নি।

উল্লেখ্য, দৈনন্দিন দু'আর জন্য 'হিসনুল মুসলিম' গ্রন্থ থেকে আরো অনেক দু'আ জানতে পারবেন।

শিশুকে তাওহিদ শিক্ষা দেয়া

কতই না সুন্দর হত! যদি আপনার শিশুর মুখে প্রথম কথাই হত তাওহিদের কালিমা। যদিও তার শব্দ উচ্চারণ হয় অস্পষ্ট ও ক্ষীনভাবে। এমন প্রত্যাশা আপনি তখনই করতে পারবেন, যখন সে আপনার মুখ থেকে কালিমাটি খুব বেশি শুনতে পাবে। আর তার সামনে এটা যত বেশি বলবেন, ততই দ্রুত সে তা রপ্ত করে নিতে পারবে।

ইবরাহিম আত-তাইমী রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, শিশুর মুখে সর্বপ্রথম যেই কথাটি তারা শিক্ষা দিতে পছন্দবোধ করতেন তা হলো সাতবার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লহ'। তখন এটাই হতো তার জীবনের প্রথম বাক্য।[২১]

শিশুকে সর্বপ্রথম কালিমায়ে শাহাদাত শিক্ষা দেয়া আপনার পক্ষে অসম্ভব কিছু না। সে দুগ্ধপোষ্য থাকা অবস্থায়ই তার থেকে বারবার পুনরাবৃত্তি করার আবেদন করবেন। যদিও আপনি এটা জেনে থাকবেন যে, সে এখনো কথা বলতে শিখেনি।

ইসহাক ইবনু আবদিল্লাহ তার দাদী উম্মে সুলাইম থেকে বর্ণনা করেন যে, সে যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর ঈমান আনলো, তখন আনাসের পিতা এসে বললো, 'তুমি কি বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করলে?'

[২১] মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা, হাদিস নং ৩৫০০।

তিনি বললেন, না, আমি ত্যাগ করিনি। তবে এই লোকটির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি।

তিনি বলেন, তখন সে আনাসকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে ইশারা করে শিক্ষা দিতে লাগলেন, বলো, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লহ'। বলো, 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'।

রাবী বলেন, তিনি তা-ই করলেন।

রাবী বলেন, তখন আনাসের পিতা তার আম্মাকে বললো, আমার বিপক্ষে আমার সন্তানকে তুমি নষ্ট করো না। তখন তিনি (আম্মা) বললেন, আমি তাকে নষ্ট করছি না।

রাবী বলেন, এরপর আনাসের পিতা ঘর থেকে বের হয়ে একজন শত্রুর সাথে সাক্ষাত হলে তাকে হত্যা করে দেয়। এ হত্যার সংবাদ তার স্ত্রীর কানে পৌঁছালে তিনি বলেন, কোনো সমস্যা নেই। আমি আনাসকে দুধ পান করানো ছাড়বো না যতক্ষণ না সে স্তনের বোঁটা ছেড়ে দেয়।

উপরোল্লেখিত ঘটনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, দুগ্ধপোষ্য থাকা অবস্থায়ই শিশুকে তাওহিদের কালিমা শিক্ষা দেয়া।

ইবনু কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহু ছোট বয়সেই সন্তানদেরকে বিশেষভাবে তাওহিদ শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে বলতেন, যখন সন্তানের কথা বলার সময় হয় তখনই তাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' শিক্ষা দেয়া। তার কানে প্রথম আওয়াজই যেন আল্লাহ তাআলার পরিচয় ও তাওহিদ দিয়ে শুরু হয়। আল্লাহ তাআলা তো আরশের উপর থেকেই দেখবেন এবং তাদের কথা শুনবেন। তিনি তাদের সাথেই থাকেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন।

শিশুমনে আল্লাহ ও নবিজির ভালোবাসার বীজ বপন করা

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকবে, সে ঈমানের স্বাদ ও মিষ্টতা আস্বাদন করবে। গুণগুলো হলো:

১. যার নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সব কিছু অপেক্ষা বেশী প্রিয়।

২. যে আল্লাহ তাআলার জন্য ভালোবাসা রাখে এবং আল্লাহ তাআলার জন্য শত্রুতা পোষণ করে।

৩. ভয়াবহ আগুনে প্রজ্জ্বলিত হওয়া অধিকতর সহজ মনে হয় আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে অংশিদার সাব্যস্ত করা।'[২২]

এ হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সন্তানদের হৃদয় ভূমিতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসার বীজ বপন করার শিশুকালই অধিক গুরুত্বপূর্ণ সময়। অবশ্য এর সবচে' সহজ পদ্ধতি হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা সমৃদ্ধ সুন্দর সুন্দর বাক্য বা সঙ্গীত তাদের নিকট খুব বেশি বেশি বলা। আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নামের দ্বারাই আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পেয়ে থাকে। এ জন্য আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নাম বেশি বেশি শুনানো। যেমন, রাজ্জাক, ছামিউ', বাছীর, গফুর, শাকুর ইত্যাদি। সন্তানের সামনে বেশি বেশি আল্লাহ তাআলার শুকর আদায় করা। এভাবে বলা,

* সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাদেরকে খাদ্য ও পানীয় দান করেছেন।

* সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাদেরকে বস্ত্র পরিধান করিয়েছেন এবং আমাদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছেন।

* সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাদেরকে সুস্বাস্থ্য দান

[২২] সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৪৯৮৭।

করেছেন।

* সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাদেরকে পথপ্রদর্শন করে অনুগ্রহ করেছেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে উপদেশ দিয়ে বলেছেন—

> "যখন বান্দা খাবার খেয়ে কিংবা পানি পান করে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে তখন নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা বান্দার সন্তুষ্ট হয়ে যান।"[২৩]

সে মুহূর্তটা কতইনা আনন্দময় হবে, যখন আপনার সন্তান আপনাকে দেখবে, আপনি আল্লাহ তাআলার নেয়ামত পেয়ে শুকর আদায় করার জন্য সিজদায় পড়ে আছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, যখন নবিজির নিকট কোনো আনন্দের বিষয় আসতো বা সুসংবাদ দেয়া হতো, তখন তিনি আল্লাহ তাআলার শুকর আদায়ের জন্য সিজদায় পড়ে যেতেন।[২৪]

সহজ একটি উদাহরণ লক্ষ্য করুন! যেটা আপনার সন্তান বুঝবে। উদাহরণত, তার পিতা মিষ্টিদ্রব্য জাতীয় কিছু আনলো অথবা সুন্দর খেলনা জাতীয় কোনো বস্তু আনলো। আপনি তার সামনে আনন্দ প্রকাশ করে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহ!! অতঃপর আল্লাহ তাআলার শুকর আদায়ের জন্য সিজদায় চলে গেলেন। তখন আপনার সন্তান আল্লাহ তাআলার সম্পর্ক খুঁজে পাবে। সকল নিয়ামত পেয়ে তার প্রশংসা আদায়ে হবে সচেষ্ট।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের নিদর্শন হলো—পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছেদের ক্ষেত্রে তাঁর সুন্নতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া। বিশেষ ভঙ্গিতে আপনার সন্তানের সামনে

---

[২৩] আস সহিহ, ইমাম মুসলিম: ২৭৩৪।
[২৪] আস সহিহ, ইমাম মুসলিম: ২৭৩৪।

মাসনূন দু'আগুলো পাঠ করা। যেমন, বলা হলো, খাবারের পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বলো! আমাদের প্রিয় নবি আমাদেরকে এরূপ শিক্ষা দিয়েছেন।

ডান হাতে খাও! আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে শিখিয়েছেন।

চলো, আমরা নামায সময় মত আদায় করি! আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এ ব্যাপারে উপদেশ দিয়েছেন।

মোটকথা, শিশুরা অল্প সময়েই সবকিছু আয়ত্ব করতে ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়; যা বড়রা পারে না। আপনার উচ্চারিত ঐ শব্দগুলোই সে মুখস্থ করে ফেলবে এবং তার স্মৃতিপটে গেঁথে যাবে। এভাবে সম্পর্ক হতে হতে একপর্যায়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা তার অন্তরে সবচেয়ে বেশি হয়ে যাবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শৈশবকাল: দুই বছর থেকে ছয় বছর পর্যন্ত

শৈশবকাল: দুই বছর থেকে ছয় বছর পর্যন্ত

শিশুদের উপস্থিতিতে দু'আ করা

নেক কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ ও হৃদয়ে নেককাজ বদ্ধমুল হওয়ার জন্য দু'আর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বিশেষকরে আপনার কোমলমতি শিশুর বেলায়। দু'আর মাধ্যমে আপনার কথা শুরু করা ও অভিনন্দন জানানো অসম্ভব সুন্দর একটি কাজ। কারণ এর দ্বারা তাদের অন্তরে আপনার প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি পাবে। যেমন, আপনি তাদেরকে বললেন—

আমাকে গ্লাসটি দাও, আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হোন!

আল্লাহ তোমাকে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করুন! আমার চাদরটি নিয়ে এসো, আমি গায়ে জড়াবো।

তুমি কি দরজা বন্ধ করতে পারবে? আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করুন! এ ধরণের আরো অনেক দু'আ করা যেতে পারে।

এ ব্যাপারে বাস্তবমুখী অনেক সুন্দর-সুন্দর ঘটনা রয়েছে।

এক বোনের গল্প

এক বোনকে আল্লাহ তাআলা সাতজন সন্তান দান করেছেন। যারা অল্প

বয়সেই কুরআন হিফজ সম্পন্ন করেছে। তাদের হিফয সম্পন্ন করার ব্যাপারে যখন তাদের মা-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন সে বললন, যখন তাদের কেউ কোনো ভালো কাজ করতো, তখন আমি তাকে শুনিয়ে-শুনিয়ে তার জন্য দু'আ করতাম। আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন! তোমাকে হাফেযে কুরআনদের অন্তর্ভুক্ত করুন। এই আশা করতাম যে, হয়তোবা কোনো এক সময় আল্লাহ তাআলার দরবারে আমার দু'আ কবুল হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলার শোকর যে, আমার সবগুলো সন্তানই আজ কুরআনের হাফিয। আল্লাহ আমার উপর বিরাট অনুগ্রহ করেছেন।

সন্তানদেরকে বদ-দু'আ দেয়া যাবে না

এখানে সন্তানদেরকে বদ-দু'আ দেয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিষেধাজ্ঞা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কেননা এসব কারণেই তারা নষ্ট হয়ে যায় ও তাদের হতভাগা হতে হয়।

> রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন— "তোমরা নিজেদের জন্য বদ-দু'আ করো না, তোমাদের সন্তানদের প্রতি বদদু'আ দিও না, তোমাদের খাদেমদের জন্য বদ-দু'আ করো না এবং ধন-সম্পদের উপরও বদ দু'আ করো না। কেননা ঐ সময়টি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে কবুলের মুহূর্তও হতে পারে, ফলে তা কবুল হয়ে যাবে।"[১]

বর্ণিত আছে—এক লোক আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহু এর কাছে এসে তার ছেলের অবাধ্যতার ব্যাপারে অভিযোগ করলো। তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি কি তাকে কখনো বদ-দু'আ দিয়েছো? সে বললো, হ্যাঁ। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহু বললেন—তুমিই তার জীবন নষ্ট করেছো।

---

[১] সুনানু আবি দাউদ: ১৫৩২।

সন্তানদেরকে দু'আ শিক্ষা দেয়া

যেমনিভাবে দু'আ সন্তানের অন্তরে যাদুর মতো কাজ করে; ঠিক তেমনিভাবে পিতা-মাতার এবং যিনি সন্তানকে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক করিয়ে দিবেন ও সকল বিষয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করার উপর পরিচর্যা করবেন; তার দু'আও অন্তরেও যাদুর মতো কাজ করে। সুতরাং দু'আ হলো ব্যাপক-বিস্তৃত একটি ইবাদত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—দু'আই হলো ইবাদত।[২]

পবিত্র কুরআনুল কারিমে বর্ণিত হয়েছে—

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

> 'আর তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। নিশ্চয় যারা অহংকার বশতঃ আমার ইবাদত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'[৩]

সুতরাং, দু'বছর বয়স থেকেই শিশুকে নিজের জন্য দু'আ করতে শিখানো উচিত। এর পদ্ধতি হলো যখন আপনি দু'আ করবেন তখন সন্তানকে আপনার দু'আ মনোযোগের সহিত শুনানো। এবং তাকে দু'আর পর 'আমিন' বলার জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন।

সন্তানের বয়স যখন চার বছরে উপনীত হবে, আপনি তার সাথে দু'আর গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা শুরু করবেন। তাকে বুঝাবেন, আল্লাহ তাআলা কখনো বান্দার দু'আ দ্রুত কবুল করেন, আবার কখনো বিলম্বে কবুল করেন। এর মধ্যে এমন হেকমত রয়েছে যা তিনি ছাড়া আর কেউই জানেন না। তবে তিনি আমাদের জন্য যেটা উত্তম সেটাই কবুল করেন। সাথে সাথে সন্তানকে দু'আ করার জন্য বারবার অনুশীলন করানো।

[২] আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ৩৩৭২।
[৩] সূরা গাফের: ৬০

যেমন—

খাদ্য-দ্রব্য ক্রয় করার প্রয়োজন, আপনি তার কাছে দু'আ চাইবেন এই বলে যে, 'আল্লাহ যেনো তোমার আব্বুকে ক্রয় করার তাওফিক দান করেন এবং ক্রয় করা তার জন্য সহজ করে দেন।' আবার আপনি তাকে শুনিয়েও দু'আ করবেন। তবে এ কাজটি মাসিক বেতন পাওয়ার দু-একদিন পূর্বে করতে হবে।

উঁচু আওয়াজে সন্তানের সামনে বলা, 'যদি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সম্পদ দান করেন, তাহলে আমরা দান-খয়রাত করবো। প্রতিদিন তাকে সাথে নিয়ে দু'আ করা। এর কিছুদিন পর কিছু টাকা বের করে তাকে বলবেন, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমাদেরকে কিছু টাকা দিয়েছেন। আমরা এগুলো দান করবো। আর ঐ টাকা যে, কোনো দরিদ্র ব্যক্তিকে দেয়ার জন্য তাকে উৎসাহ প্রদান করবেন।

সন্তান কোনো কিছুর আবদার করলে তাকে দু'আ করার জন্য পীড়াপীড়ি করা। মা হলে নিজ স্বামীকে এই বিষয়ে অবগত করা। যেন সে তার আবদার পূরণ করে। এগুলোর মাধ্যমে আপনার সন্তানের অন্তরে দু'আর মহত্ত্ব বুঝে আসবে। সেই সাথে তাকে ভালো কাজের জন্য তাওফিক লাভের দু'আ করতে অভ্যস্থ করা। দুনিয়া ও প্রবৃত্তি যেন এর সাথে সম্পৃক্ত না হয়।

এ সব কাজ তখনই সম্ভব হবে যখন আপনি আপনার সন্তানকে দু'আর প্রতি গুরুত্ব দিবেন। এখানে কিছু দু'আর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হলো:

'হে আল্লাহ! আমি আপনার সাথে সাক্ষাত করার আগ্রহ প্রকাশ করছি এবং আপনার সুদর্শন চোহারার দিকে তাকানোর স্বাদ কামনা করছি।

হে আল্লাহ! আমার চরিত্র সুন্দর করে দিন যেমনিভাবে আপনি আমাকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে ক্ষমা করুন। তাদের

উপর রহম করুন। যেমন তারা ছোট সময়ে আমাকে লালন-পালন করেছেন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার যিকির, শুকর ও উত্তম ইবাদতের উপর সহযোগিতা করুন।

পিতা-মাতার জন্য শিশুকে দু'আ শিখানোর প্রতি গুরুত্ব দেয়া মূলত তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার নামান্তর। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—আল্লাহ তাআলা যখন তার কোনো নেককার বান্দার মর্যাদা জান্নাতে উচূ করবেন তখন সে বলবে, হে প্রতিপালক! এতো মর্যাদার অধিকারী আমি কিভাবে হলাম? তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনা করার কারণে, কারণ সে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতো।

শিশুর আবদার পূরণ করার ক্ষেত্রে কখনো কখনো এরূপ কাজ করা, যেন সে দু'আ কবুল হওয়ার স্বাদ অনুভব করতে পারে। এতে আল্লাহ তাআলার সাথে তার সম্পর্ক গভীর হবে। সে আল্লাহ তাআলার প্রতি সর্বদা মনোনিবেশ করে থাকবে। তারই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। এতে সে এটাও শিখবে যে, দু'আ সাথে সাথেই কবুল হয় না। বরং অনেক সময় একটু দেরী হয় এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ বান্দাকে পরীক্ষা করেন। এ ধরণের বিষয়গুলোও ধীরে-ধীরে বুঝানো, যাতে দু'আর প্রতি বিরূপ ভাবনা তৈরী না হয়।

একটি ঘটনা

এক বোনের একজন সন্তান রয়েছে। বয়স মাত্র ছয়ের কোঠায় পৌঁছেছে। সন্তানটি চাচ্ছিলো তার আম্মু যেন ঘুমের সময় তার পাশে বসে। এ কথা ভেবে সে নিম্নস্বরে কাকুতি-মিনতি করে দু'আ করতে লাগলো। অতঃপর তার আম্মু অন্যান্য দিনের মতো না করে তার পাশে বসার জন্য চলে আসলো। হঠাৎ তার আম্মুকে দেখতে পেয়ে বলতে লাগলো,

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আমার দু'আ কবুল করেছেন। কারণ আমি আল্লাহ তাআলার কাছে খুব কাকুতি-মিনতি করে দু'আ করেছি, যেন তুমি আমার পাশে এসে বসো।

এখানে আরেকটি ঘটনা আছে, যা অধ্যক্ষ উম্মে হানী উল্লেখ করেছেন, কিভাবে উত্তম কৌশল করে আল্লাহ তাআলার সাথে সন্তানের সম্পর্ক তৈরী করা যায়।

ছোট সন্তান তার আম্মুর কাছে একটি জিনিস চেয়ে খুব পীড়াপীড়ি করতে লাগলো।

আম্মু সবরের সাথে বললেন, না আমি তোমাকে দিব না; যে পর্যন্ত পীড়াপীড়ি না ছাড়বে।

ছেলে কোনোভাবেই মানছিল না। সে তার জিদ ধরেই বসে থাকল।

আম্মু রাগত স্বরে বললেন, আমি বলছি না, দিব না। সাবধান, বাড়াবাড়ি করো না। প্রথমে আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করো। তুমি এখন আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করবে। আল্লাহ তোমার দু'আ কবুল করবেন। আমার মনে হচ্ছে—তুমি আল্লাহ তাআলার কাছে চাইলে, আমি তোমার আবদার পূরণ করার যথাসম্ভব চেষ্টা করব। তবে কিভাবে করব সেটা আমি জানি না।

তুমি আল্লাহ তাআলার কাছে কাকুতি-মিনতি করে দু'আ করতে পারো, যেন আমি তোমার আবেদন পূরণ করতে পারি।

ছেলেটির চোখে রহস্যের অশ্রু বয়ে যাচ্ছিলো। তাহলে অবশ্যই আমি আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করবো। এই বলে সে এক চিমটি মৃদু হাসি দিয়ে তার আম্মুর সামনে থেকে চলে গেল।

তার আম্মু রাগতস্বরে তার দিকে তাকিয়ে বললো, সাবধান! আমার জন্য এমনটি করবে না; আমার ভয় হচ্ছে, হয়ত আল্লাহ তোমার দু'আ কবুল করে ফেলবেন। আবারো ছেলেটি ফিক হেসে তার আম্মুকে বললো,

শীঘ্রই আমি দু'আ করছি। অতঃপর ছেলেটি খুব মিনতির সাথে আসমানের দিকে হাত তুলে আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করলো, যেন আল্লাহ তাআলা তার আম্মুকে প্রয়োজন পূরণ করার তাওফিক দান করেন।

তার আম্মু খুঁশি হয়ে তার হাত নামানোর চেষ্টা করলো। ঝাঁজালো কণ্ঠে আওয়াজ করে বলল, এই ছেলে! থামো, আর দু'আ করতে হবে না। আবার অন্য সময় করবে। ঠিক সন্ধ্যা বেলা ছেলেটি আবারো প্রয়োজন পূরণের আবদার নিয়ে আম্মুর কাছে উপস্থিত হয়ে বললো, আম্মু! আমার প্রয়োজন মিটিয়ে দাও।

আম্মু প্রত্যাখ্যান না করার ভঙ্গিতে বললেন, আচ্ছা, আল্লাহ সহজ করে দিবেন। দেখছি! তবে আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। আমি দেখব, তুমি কি করো? দিন-দিন তো তুমি অনেক দুষ্ট হয়ে যাচ্ছো।

ছেলেটি ঢের খুশি হয়ে বললো, আল্লাহ চাহে তো ইশার পর তোমার তাওফিক হয়ে যাবে।

আম্মু কৌতহলী ভঙ্গিতে বললো, তুমি ইশার সময় নির্ধারণ করে বললে কেন?

ছেলেটি হাসোচ্ছলে বললো, কেননা আমি আবার সিজদার মধ্যে দু'আ করব। আর আমার জানা আছে যে, আল্লাহ তাআলা আমার দু'আ কবুল করবেন।

আম্মু মুচকি হেসে বললেন, আচ্ছা, দেখব।

ইশার পর ছেলেটি পুনরায় তার আম্মুর কাছে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। আম্মু! প্লীজ, প্রয়োজন পূরণ করে দাও!

আম্মু অপ্রত্যাখ্যানের ভঙ্গিতে বললেন, নিরাশ হয়ো না।

ছেলেটি বললো, আমার প্রতি দয়া করো।

আম্মু বাধ্য হয়ে তিরস্কারের ছলে বললেন, দুষ্ট! তোকে এভাবে দিয়ে

দিলেই তো দু'আ করা ছেড়ে দিবি। আর আল্লাহ তাআলা দু'আর মধ্যে পীড়াপীড়ি করাকে পছন্দ করেন। বিশেষ করে শিশুদের দু'আ।

ছেলেটি খুঁশিতে ফেটে পড়লো। আর বলতে লাগল, কখনোই না। আল্লাহ তাআলার কসম! আমি দু'আ কখনোই ছাড়বো না।

আনন্দ ভরা কণ্ঠে আম্মু বললেন, আল্লাহ তোকে সুবুদ্ধি দান করুন!!!

উপরোল্লেখিত এই ঘটনায় সন্তানকে দু'আর গুরুত্ব বুঝাতে মা এখানে সফল। তার এই অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও এই কৌশলেই অন্য কোনো মা সফল হবে না। কেননা প্রতিটি শিশুরই চিন্তা, বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব অন্যের তুলনায় কিছুটা ভিন্ন হয়। এজন্য প্রত্যেক মায়ের জন্য কর্তব্য হলো, সন্তানের সাথে এমনভাবে পরিচিত হওয়া এবং এমন শিক্ষা-মাধ্যম ও কৌশল অবলম্বন করা, যেন শিশু তার অনুসরণ করে।

আল্লাহ তাআলার বিরাজমানতা অন্তরে সৃষ্টি করা

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই একটা সময় আসে, যে সময় সে অন্যকে পরিপূর্ণরূপে বুঝে। তাকে অনুসরণ করে। তার অনুকরণ করে। তার প্রতি বিশেষ এক ভালবাসা কাজ করে। সে হিসেবে শিশু জীবনেও এমনটি হয়ে থাকে। তারাও মা-বাবার অনুকরণ করে থাকে। সে সময় যদি আমরা রবের প্রতি বেশী ভালবাসা দেখায় তারাও রবকে ভালবাসতে শুরু করবে। তাদের ভিতর রবের ভালবাসা রোপণ করার এটাই সবচে যথোপযুক্ত সময়।

শিশুর অন্তরে যখন আল্লাহ তাআলার ভালোবাসার বসত বাড়ী হবে এবং তার মন-মস্তিষ্কে আল্লাহ তাআলার ধ্যান ও তার প্রতি বিশ্বাসের চারা রোপিত হবে, তখন সে তার বাস্তব জীবনেও সেভাবেই গড়ে উঠবে। সে শিশু ভবিষ্যত হবে আদর্শ একজন পুরুষ কিংবা আদর্শবান একজন নারী।

শিশুর বয়স দু'বছরে পৌঁছলেই আল্লাহ তাআলার সাথে গভীর সম্পর্ক এবং আল্লাহ তাআলার ধ্যান উপলব্ধি করা শিশুর অন্তরে বদ্ধমূল করে

দেয়া যেতে পারে। বারবার তাকে কিছু উত্তম বাক্য শুনানো। এটা যেন তার স্মৃতিপটে পুঞ্জিভূত হয়। নিছক আবেগী না হয়। সময়ের পালাক্রমে সে রপ্ত করে নিবে। যেমন তাকে বললেন,

চলো, নামায পড়তে যাই। এতে আল্লাহ তাআলার সাথে আমাদের সাক্ষাত হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ভালোবাসবেন। জান্নাতুল ফেরদাউস দান করবেন।

আল্লাহ তাআলার সামনে লজ্জাশীল হও। তোমার গোপনাঙ্গ দ্রুত ঢেকে রাখ।

এতে সে অনেকটা আল্লাহ তাআলার ধ্যান উপলব্ধি করতে পারবে। আমরা আমাদের সন্তানকে আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে লজ্জাশীল বানাবো। কেননা মুআবিয়া ইবনু হাইদাহ আল কুশাইরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা আমাদের লজ্জাস্থান কতটুকু ঢেকে রাখব এবং কতটুকু খোলা রাখতে পারবো?

তিনি বললেন, তোমার স্ত্রী ও দাসী ছাড়া সকলের দৃষ্টি হতে লজ্জাস্থান হেফাযত করবে।

মুআবিয়া আবার প্রশ্ন করলেন, পুরুষেরা একত্রে অবস্থানরত থাকাকালেও?

তিনি বললেন, যতদূর সম্ভব কেউ যেন আবৃত স্থান দেখতে না পারে তুমি তা-ই করো।

তিনি বললেন, আমি আবারো প্রশ্ন করলাম, মানুষ তো কখনো নির্জন অবস্থায়ও থাকে। তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা তো মানুষের চেয়েও লজ্জার ক্ষেত্রে বেশি হকদার।[৪]

এ হাদিস থেকে এ কথাই বুঝা যায় যে, সন্তানের স্মৃতিপটে এ কথা গেঁথে দেয়া যে, আল্লাহ তাআলা সর্বদা আমাদেরকে দেখছেন।

---

[৪] আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ২৭৬৯।

তৃতীয় বছর বয়সে পদার্পণ করলে আমরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে তার সামনে আল্লাহ তাআলার ধ্যান বদ্ধমূল করার চেষ্টা করব।

কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে

তার কানে কুরআনের বাণী পৌঁছানো। সাথে সাথে ব্যাখ্যা করে দেয়া। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী—

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

> 'আর অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় সেটাও আমি জানি। আর আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী।[৫]

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

> 'আর তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।'[৬]

কিছু হাদিস ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ তাকে শুনানো। যেমন আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাদিস, তিনি বলেন, আমি একদিন (সাওয়ারীর উপর) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে ছিলাম। তখন তিনি বললেন, ওহে কিশোর! আমি তোমাকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা শিক্ষা দিব? (তুমি সেগুলো স্মরণ রেখ) তুমি আল্লাহ তাআলার বিধান সমূহ সংরক্ষণ করবে তাহলে আল্লাহও তোমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। তুমি (আল্লাহ তাআলার অধিকার সমূহ) স্মরণ রেখ, তাহলে সর্বদা তুমি তাকে সম্মুখে পাবে। যখন তুমি চাইবে, তখন আল্লাহ তাআলার কাছেই চাও। আর যখন তুমি সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করবে। আর এ

---

[৫] সুরা কাফ: ১৬।
[৬] সুরা হাদিদ: ৪।

কথা জেনে রেখো যে, যদি সকলেই তোমার উপকার করার জন্য একত্রিত হয়ে যায়, তবে ততটুকুই উপকার করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার তাকদীরে লিখে রেখেছেন। আর যদি তারা সকলে তোমার ক্ষতি সাধন করার জন্য একত্রিত হয়ে যায়; তবে ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার তাকদীরে লিখে রেখেছেন। কলমসমূহ উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং খাতাসমূহ (তাকদীরের লিপি) শুকিয়ে গেছে।' [৭]

খেলাধূলা:

আপনি আপনার শিশুকে এমন গোপন এক স্থানে খেলতে নিয়ে যাবেন, যেখানে আপনাদের দু'জনকে অন্য কেউই দেখবে না। এরপর যখন সে আপনার কাছে খেলনা চাইবে, তখন আপনি তাকে বলে দিন যে, আল্লাহ তাআলা কিন্তু আমাদেরকে সর্বত্র দেখেন।

আপনি আপনার সন্তানদের কাছে আবদার জানাবেন যে, তোমরা দু'জন এমন জায়গায় যাবে যে, কেউ যেন তোমাদেরকে দেখতে না পারে। এরপর তারা যখন ফিরে আসবে, তখন আপনি তাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করবেন, অন্যজন কি করছে? যদি আপনি তাকে খেতে দেখেন, তাহলে তাকে বলবেন যে, তুমি খেয়ো না। কেননা ভূপৃষ্ঠে এমন কোন জায়গা পাবে না যেখানে আল্লাহ তোমাকে দেখবে না।

উৎসাহ ও ভীতি প্রদর্শন:

উৎসাহ বা ভীতি প্রদর্শন কয়েকটা বাক্য ব্যবহার করেও হতে পারে। যেমন বললেন, 'আল্লাহ ভালোবাসেন' অথবা 'আল্লাহ ক্ষমা করেন'। এ ধরণের আরো বিভিন্ন বাক্য হতে পারে। অনুরূপভাবে সে যখন কোনো কাজ করতে যাবে অথবা কোন কথা অস্বীকার করার চেষ্টা করবে তখন তাকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন, আল্লাহ তোমার কর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।

১. যখন সে আপনার সাথে সত্য কথা বলবে, আপনি তার প্রশংসা করে

---

[৭] আস সুনান, ইমাম তিরমিযিঃ ২৫১৬।

বলুন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা সত্যবাদীদেরকে ভালোবাসেন।

২. যখন সে কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে ধৈর্য্য ধারণ করবে, আপনি তার প্রশংসা করে বলুন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন।

৩. যখন সে কাপড় পরিচ্ছন্নতার প্রতি যত্নবান হয় তখন আপনি তাকে বলুন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালোবাসেন। সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার ধ্যান অন্তরে সৃষ্টি করতে হলে তার ভিতরে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা সুদৃঢ় করতে হবে। তাহলে সে আল্লাহ তাআলার আদিষ্ট বিষয়ের প্রতি আনুগত্যশীল হবে। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে তার জন্য রয়েছে মনোরম জান্নাত। যার পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহর সমূহ।

৪. হ্যাঁ, যখন সে ভুল করবে; আপনি তাকে স্মরণ করিয়ে দিবেন যে, এগুলো আল্লাহ পছন্দ করেন না। যেন সে সাথে সাথেই সতর্ক হয়ে যায়। কোনো অবস্থাতেই যেন আল্লাহ তাআলার অপছন্দনীয় কাজ তার থেকে সংঘটিত না হয়। সে যদি রুমের সব কিছু এলোমেলো করে ফেলে তাহলে তাকে স্মরণ করিয়ে বলবেন, আল্লাহ তাআলা গোলযোগ সৃষ্টিকারীকে পছন্দ করেন না।

৫. যখন কেউ অপর ভাইয়ের উপর যুলুম করবে; তখন তাকে বলবেন, আল্লাহ তাআলা যালিমকে ভালোবাসেন না।

৬. সে যখন কোন বিষয়ে সীমালজ্ঘন করবে; তখন তাকে শিক্ষামূলক বলবেন, আল্লাহ তাআলা সীমালজ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। সাথে সাথে তাকে এটাও স্মরণ করিয়ে দিবেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করবে না এবং তার নিষিদ্ধ বিষয়ে লিপ্ত থাকবে সে অচিরেই আল্লাহ তাআলার জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে। আল্লাহ তাআলার দর্শন থেকেও বঞ্চিত হবে।

৭. যখন সে কোনো ভুল করে তখন 'আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন না' এই বাক্য বেশি না বলা। এর পরিবর্তে অন্য কোনো বিশেষণ যোগ

করতে পারলে করবেন।

৮. যখন তার পোশাক ময়লা হবে তখন তার সামনে বেশি বেশি বলা যে, 'আল্লাহ তাআলা পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন'। এতে করে শিশু দ্রুত বুঝে ফেলবে যে, তার ময়লা পোশাক আল্লাহ তাআলার কাছে পছন্দনীয় নয়। ফলে সে দ্রুত পোশাক পরিবর্তন করতে সচেষ্ট হবে।

কিছু বাক্য পুনরাবৃত্তি করা

কিছু বাক্য পুনরাবৃত্তি করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার ধ্যান-খেয়াল আপনার সন্তানকে শিক্ষা দিতে পারেন। যেমন বললেন, 'আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন' 'আল্লাহ আমাদেরকে দেখছেন' 'আল্লাহ আমাদের সামনে উপস্থিত আছেন।

সাহল ইবনু আবদুল্লাহ তস্তরী রাহিমাহুল্লাহু বলেন, তিন বছর বয়সে আমি গভীর রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে আমার মামাজান 'মুহাম্মদ ইবনু সিওয়ার' এর নামাযের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি কি তোমার স্রষ্টার কথা স্মরণ করো না?' তখন আমি বললাম, কিভাবে তাকে স্মরণ করবো? তিনি বললেন, তোমার কাপড় পরিবর্তন করার সময় মনে মনে (জিহ্বা না নেড়ে) তিনবার বলবে, 'আল্লাহ আমার সাথে আছেন' 'আল্লাহ আমাকে দেখছেন' 'আল্লাহ আমার সামনে উপস্থিত আছেন'।

শব্দগুলো আমি মনে মনে বলতাম। তারপর তাকে জানালাম। তিনি বললেন, শব্দগুলো প্রতি রাতে সাতবার করে বলবে।

কিছুদিন তার কথার উপর আমল করে পুনরায় তাকে জানালাম। এবার তিনি বললেন, এখন থেকে শব্দগুলো প্রতি রাতে এগারোবার করে বলবে। তখন থেকে আমি বলতে লাগলাম। আমার মনে একটা স্বাদ অনুভূত হতে লাগলো। এক বছর পর আমার মামাজান আমাকে বললেন, তোমাকে যা শিখালাম তা মনে রেখ। কবরে যাওয়া পর্যন্ত এর উপর অটল থেকো।

কেননা এগুলো তোমার দুনিয়া ও আখেরাতে উপকারে আসবে। আমি দুই বছর এর উপর আমল করে গেলাম। আর আমি মনে মনে এর একটা স্বাদ অনুভব করেছিলাম।

নবিজি আমাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ

এখন আপনি আপনার শিশুর কানে বেশি বেশি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম স্মরণ করবেন। তার কচি মনে রাসুল প্রীতির বীজ বপন করবেন। রাসুলের অনুকরণ ও প্রতিটি কাজে নববী আদর্শকে উত্তম নমুনা হিসাবে তার হৃদয়ে গেঁথে দেয়ার এটাই উত্তম সময়। এর সাথে সাথে প্রতি সপ্তাহে তাকে একটি হাদিস ব্যাখ্যা সহ শিখিয়ে দেয়া। তাকে সপ্তাহব্যাপী উক্ত হাদিসের উপর আমল করানোর চেষ্টা করা। যেমন:

খানা খাওয়ার সময়।

যখন সে খানা খাবে তখন প্রতিবারই তাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেন,

'হে বালক! বিসমিল্লাহ বলে খানা খাও। ডান হাতে খাও। তোমার সামনে থেকে খাও।'[৮]

আর যখন খাবারের কিছু অংশ পাত্রের বাহিরে পড়ে যায় তখন তাকে শিক্ষা দিন যে, সে অংশ সে কি করবে? তৎক্ষণাৎ তাকে স্মরণ করিয়ে দিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ বাণী। 'তোমাদের কেউ যখন খাবার খায় আর তার লোকমা মাটিতে পড়ে যায়, তবে সে যেন লোকমার সাথে লেগে থাকা ময়লা দূর করে খেয়ে ফেলে। শয়তানের জন্য যেন তা রেখে না দেয়।'[৯]

খাবার শেষ হওয়ার পর তাকে আঙ্গুলসমূহ চেটে খাওয়ার কথা স্মরণ

[৮] আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ৫৩৭৬।
[৯] আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ১৮০২।

করিয়ে দেয়া। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> ‘তোমাদের কেউ যখন খাবার খায়, সে যেন তার আঙ্গুলগুলো চেটে খায়। কারণ সে জানে না খাদ্যের কোন অংশে বারাকাহ (কল্যাণ) রয়েছে।’[১০]

এভাবে সে যখন প্রতিটি কথা ও কাজে সে বেড়ে উঠবে এবং অনুশীলন করবে যে, আমাদের প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে অনুকরনের মূল কেন্দ্র হলেন প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তখন আপনি দেখবেন যে, প্রতিটি নতুন নতুন পদক্ষেপে সে আপনাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে।

আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা

আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করলে অন্তরে একটা অতুলণীয় স্বাদ অনুভূত হয়। যা মানুষ নিজ অন্তরে খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারে। আর আল্লাহ তাআলার সাথে শিশুদের ভালবাসার সম্পর্ক তৈরী হলে আল্লাহ তাআলার কুদরত সরাসরি প্রত্যক্ষ করতে পারবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি বিশেষ আদর্শ হলো স্বজাতিকে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করার আহ্বান করা। যেন তারা ঈমান আনতে পারে। তাদের ঈমানের মধ্যে প্রবৃদ্ধি ঘটতে পারে। আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলী চিন্তা করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও মহত্ত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। তাঁর একত্ববাদীতা অকপটচিত্তে স্বীকার করা যায়। ইবাদতের একমাত্র উপযুক্ত হিসেবে তাকেই মানার মতো দৃঢ় মানসিকতা তৈরী হয়।

এখানে দুই ধরনের চিন্তা রয়েছে। যেগুলো আপনি আপনার সন্তানের সামনে উল্লেখ করবেন যখন সে চার বছর বয়সে উপনীত হবে।

[১০] আস সহিহ, ইমাম মুসলিমঃ ২০৩৫।

» শিশুর সামনে আল্লাহ তাআলার যেসব দৃশ্যমান সৃষ্টি রয়েছে। যেমন, শিশু তার নিজ শরীর এবং শামিয়ানার ন্যায় বেষ্টন করে রাখা আসমান, যমিন, উদ্ভিত ও জীব-জন্তু ইত্যাদি।

» কুরআনের কিছু কিছু আয়াত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা। তার সামনে আয়াতগুলোর অর্থ সুন্দর সাবলীল ও রসালো ভাষায় উপস্থাপন করা। যেন সহজে সে তা বুঝতে পারে। আল্লাহ তাআলার বাণী—

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا

> 'তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, কিভাবে আল্লাহ স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন। আর এগুলোর মধ্যে চাঁদকে সৃষ্টি করেছেন আলো আর সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন প্রদীপরূপে। আল্লাহ তোমাদের উদগত করেছেন মাটি থেকে। তারপর তিনি তোমাদেরকে তাতেই ফিরিয়ে নিবেন এবং নিশ্চিতভাবে তোমাদেরকে তা থেকে পুনরুত্থিত করবেন। আর আল্লাহ পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিস্তৃত করেছেন, যেন তোমরা সেখানে প্রশস্ত পথে চলতে পারো।' [১১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا

[১১] সুরা নূহঃ ১৫-২০।

> অর্থ: 'আমি কি যমিনকে শয্যারূপে নির্মাণ করিনি? আর পর্বতসমূহকে পেরেক? আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়। আমি তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রাম, রাতকে করেছি আবরণ, দিনকে করেছি জীবিকার্জনের সময়। তোমাদের উপরে মজবুত সপ্তাকাশ বানিয়েছি। আর আমি সৃষ্টি করেছি উজ্জল একটি প্রদীপ। আমি তোমাদের জন্য মেঘমালা থেকে প্রচুর পানি বর্ষণ করেছি। যেন আমি তা দিয়ে শস্য, উদ্ভিদ এবং ঘনঘন উদ্যান সমূহ উৎপন্ন করতে পারি। নিশ্চয় ফায়সালার দিন নির্ধারিত আছে।' [১২]

তাওহীদ শিক্ষা দেয়া

নবিগণ তাদের সন্তানদেরকে তাওহীদ শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাদের মনোতুষ্টি ছিল যে, শিশু যখন একটু বড় হবে এবং তাওহীদের উপর প্রতিপালিত হবে তখন সে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার উপরই মৃত্যুবরণ করবে। তাই নবি ইবরাহিম ও ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাদের সন্তানদেরকে তাওহীদ আঁকড়ে ধরার ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন—

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَابَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

> 'আর ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তার সন্তানদেরকে এবং ইয়াকুবকে (তাওহিদ এর) উপদেশ দিয়েছেন। হে আমার সন্তানেরা! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে চয়ন করেছেন। সুতরাং তোমরা মুসলিম হওয়া ছাড়া মৃত্যুবরণ করো না।' [১৩]

ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তার সন্তানদেরকে বললেন—

---

[১২] সুরা নাবা: ৬-১৬।
[১৩] সুরা বাকারাহ: ১৩২।

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

> ‘ইয়াকুবের মৃত্যু যখন ঘনিয়ে এল, তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? যখন সে তাঁর সন্তানদেরকে বললো, আমার (মৃত্যুর) পর তোমরা কার ইবদাত করবে? তারা বললো, আমরা আপনার ইলাহের এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহিম, ইসমাইল ও ইসহাকের ইলাহের ইবাদাত করব। যিনি এক ইলাহ। আর আমরা তাঁরই অনুগত।’ [১৪]

লোকমান আলাইহিস সালাম স্বীয় ছেলেকে বললেন—

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

> ‘আর স্মরণ করুন ঐ সময়কে যখন লোকমান তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলো, প্রিয় বৎস! আল্লাহ তাআলার সাথে শিরক করো না। নিশ্চয় শিরক হলো বড় যুলুম।’ [১৫]

অনুরূপভাবে সালাফগণও এমন ছিলেন। আমর ইবনু কায়স আল-মালাহী রাহিমাহুল্লাহু বলেন—‘যখন তুমি কোনো যুবককে সর্বপ্রথম আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের পথ ও মতের উপর বেড়ে উঠতে দেখবে তখন তুমি তার ব্যাপারে কল্যাণের আশা করতে পারো। আর যদি তুমি তাকে বেদআতিদের সাথে দেখতে পাও; তাহলে তার ব্যাপারে নিরাশ হতে পারো। কেননা যুবকরা সর্বপ্রথম যেই জিনিসের উপর বেড়ে উঠে সেটার উপরই অবিচল থাকে।’

অতএব, হে জননী! আপনার উপর আবশ্যক হলো এই স্তরে যখন

---

[১৪] সূরা বাকারাহ: ১৩৩।
[১৫] সূরা লোকমান: ১৩।

আপনার শিশু পৌঁছবে, বিশেষকরে তিন বছর বা তারচে' একটু বেশী হলেই তার কানে আল্লাহ তাআলার তাওহীদ বিষয়ক ঘটনাবলী বেশী-বেশী পুনরাবৃত্তি করা। অনুরূপভাবে ছোট-ছোট এমন কিছু ঘটনা তাকে শুনানো, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলার সত্তাগত ও গুণবাচক নাম তার নিকট স্পষ্ট হয়ে যায়। সাথে-সাথে তাকে এগুলো শিক্ষা দেয়া ও সংহতকরণের জন্য ভিন্ন কোনো পন্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। প্রখ্যাত মুফাসসির শাইখ সা'দী রাহিমাহুল্লাহু বলেন—'প্রজ্ঞা হলো ইলমের মাধ্যমে দাওয়াত দেয়া, অজ্ঞতার মাধ্যমে নয়।'

মোটকথা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দিয়ে কাজ শুরু করা। কেননা এটা স্মৃতিপটে ধরে রাখার এক অনুপম মাধ্যম।

শিশুদেরকে মাসনূন দু'আ ও তাওহীদ শিক্ষা দিবেন কিভাবে, এ ব্যাপারে সুন্দর একটি ঘটনা আছে।

আম্মু! কেন আমরা জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করলাম না?

একটি কন্যা শিশু আছে। তার বয়স এখনো তিন বছর হয়নি। সে তার আম্মুর পিছনে দাঁড়িয়ে; ফ্রক বা গাউন পেঁচিয়ে তোতলামীপনা শব্দে বলছে, আম্মু, আম্মু! কেন আমরা জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করলাম না?

তখন তার আম্মু তার চতুর্পাশ্বে ঘিরে থাকা সন্তানদের সামনে বসলেন। (যাদের বয়স দেড় বছর থেকে দশ বছর পর্যন্ত) তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য বিশেষ আসর বসালেন।

আম্মু সন্তানদেরকে নিয়ে সূরা ইখলাস পাঠ করা শুরু করলেন। সবাই দশবার পড়লো। অতঃপর তারা আনন্দের সহিত কণ্ঠ মিলিয়ে আওয়াজ করে বললো, 'আল্লাহ তাআলার প্রশংসা যে, আমরা জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেছি।'

এরপর মা তার সন্তানদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এ ঘরে কি রাখতে চাও? সন্তানরা এক কণ্ঠে উত্তর দিলো, আম্মু! রত্নভাণ্ডার। তারা "লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" বলতে শুরু করলো।

তারপর পুনারায় তার আম্মু তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কে আগ্রহী যে, ফেরেশতারা তার জন্য মাগফেরাত করবে? এ কথা শুনে তারা সকলেই বলতে শুরু করলো, 'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিও ওয়ালা আলি মুহাম্মদ, কামা সাল্লাইতা আলা ইবরহিমা ওয়ালা আলি ইবরাহিম..।

এরপর তারা তাসবীহ, তাহলীল ও তাকবীর বলতে লাগলো। এগুলো শেষ করে যার যার কাজ ও খেলা-ধুলায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

দেখুন! মা তার সন্তানদেরকে তার প্রতি ভালোবাসা ও তার সাথে বসার আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য কিভাবে সময় দিলেন। তাদেরকে শিক্ষা দিলেন এবং আল্লাহ তাআলার যিকিরের উপর অভ্যস্ত করলেন। তার এ কথার সূত্র হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ বাণী— 'যে ব্যক্তি 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' শেষ পর্যন্ত ১০ বার পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতে এক মহল নির্মাণ করেন।'[১৬]

আরেক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনু কায়সকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবনু কায়স! তুমি পড়বে 'লা হওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'। কারণ এ দু'আ হলো জান্নাতের রত্নভাণ্ডার।[১৭]

অনুরূপভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে আমার উপর যত দরূদ পাঠ করবে, ফেরেশতারা তার জন্য ততবার ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবেন। সুতরাং বান্দা চাহে তো কম করুক বা বেশি করুক।[১৮]

---

[১৬] আল মুসনাদ, ইমা আহমাদঃ হাদিস নং ১৫৬১০।
[১৭] আস সুনান, ইমাম তিরমিযিঃ ৬৩৮৪।
[১৮] আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হাদিস নং ১৬৬৯।

মা তার সন্তানদেরকে উপরোক্ত দু'আগুলো এমন এক অসাধারণ পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলেন; যা তারা খুব সহজেই রপ্ত করে নিতে সক্ষম হলো।

প্রথমে ঈমান শিখানোর প্রতি গুরুত্ব দেয়া

সালাফে সালেহীন সন্তানদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি যেই জিনিসের গুরুত্ব দিয়েছেন সেটা হলো, কুরআন মুখস্থ করানোর পূর্বেই তাদেরকে হালাল-হারাম, আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ শিক্ষা দেয়া। ফলে শিশু আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে বেড়ে উঠবে। তাঁর আদেশ পালন ও নিষেধ পরিত্যাগ করার পূর্ণ মানসিকতা তাদের ভিতর কাজ করবে। প্রথমেই শরয়ি ইলম শিক্ষা করার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, পূর্ণ কুরআন হিফয করা। বরং যে কোনো আয়াত মুখস্থ করার পূর্বে সে ঐ আয়াতে বর্ণিত বিধি-নিষেধ শিখে নিবে। তাহলে এটা তার স্মৃতিপটে ঈমানের ভীত সুদৃঢ়করণের মজবুত এক মাধ্যম হবে। অতঃপর পরবর্তী আয়াতের দিকে যাওয়া। এর অর্থ শিখে নেয়া। এর প্রয়োগ পদ্ধতি জেনে নেয়া। তারপর মুখস্থ করার পদক্ষেপ নেয়া।

জুন্দুব ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ছিলাম। আমরা ছিলাম শক্তিশালী ও টগবগে যুবক। তখন আমরা কুরআন শেখার পূর্বে ঈমান শিখেছি। তারপর আমরা কুরআন শিখেছি। ফলে আমাদের ঈমান আরো বেড়ে গিয়েছে।'[১৯]

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমাদের উপর দিয়ে এমন একটা সময় অতিবাহিত হয়েছে যে, আমাদের কুরআন শেখার পূর্বে ঈমান শিখতে হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর কোনো সূরা অবতীর্ণ হলে আমরা তার হালাল-হারাম, আদেশ-নিষেধ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আরো যা কিছু জানা যায় আমরা শিখে নিতাম। যেমন তোমরা কুরআন শরিফের

[১৯] আস সুনান, ইমাম ইবনু মাজাহ, হাদিস নং ৫২।

সূরা শেখো। আমি অনেক লোককে দেখেছি তাদেরকে ঈমান শেখানোর পূর্বে কুরআন শিখানো হয়। তারা সুরা ফাতিহা থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত পড়ে। কিন্তু এর হালাল-হারাম, আদেশ-নিষেধ এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অতিরিক্ত কিছু অবগত হওয়া যায় এমন কিছু শিখে না। তারা নিম্নমানের খেজুর ছিটানোর ন্যায় ছিটিয়ে দিচ্ছে।' [২০]

কুরআনের আয়নায় তাদের জীবন প্রতিপালিত হওয়া আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিশেষ এক নেয়ামত। শুধু কি তাই! এটা হলো শ্রেষ্ঠ নেয়ামত যা প্রতিটি মা-ই কামনা করে, যেন আল্লাহ তাকে উত্তম নেয়ামত দান করেন। সে এই কুরআন মুখস্থ করে আল্লাহ তাআলার প্রিয় ও নিকটতম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

শিশু বয়সেই কুরআন মুখস্থ করিয়ে দেয়া

শিশু বয়সে কুরআন মুখস্থ করা অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। এতে অনেক উপকার রয়েছে। যেমন:

১.শিশু মন কুরআনের সাথে সম্পৃক্ত হবে। তার মধ্যে কুরআনের ভালোবাসা জম্মাবে। কুরআনের সাথে যখন তার সম্পর্ক তৈরী হবে এবং আয়াতের উপর সে যখন চোখ মেলে তাকাবে, তখন সে কুরআনের চরিত্রে চরিত্রবান হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে।

২. তার প্রতিভা বিকশিত হবে। মেধাশক্তি শাণিত হবে। কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষা ব্যবস্থা এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, যেসব শিক্ষার্থীরা কুরআনের হাফিয, তারা পড়াশোনায় অন্যদের তুলনায় অনেক এগিয়ে থাকে।

৩. যবান সঠিক হয়। বাকশক্তি সুন্দর হয়। হরফের মাখরাজ বিশুদ্ধ হয়। ভাষাগত সম্পদ বৃদ্ধি পায়। যেমন—শব্দতত্ত, অর্থবিদ্যা ও বিভিন্ন বাগধারা ইত্যাদি।

---

[২০] ইবনু মান্দাহঃ হাদিস নং ১০৬।

৪. ছোট বয়সেই যারা কুরআন মুখস্থ করে অর্থ বোঝে, তারা তো আল্লাহ প্রদত্ত নূর ও হেদায়েতের ছায়ায় প্রতিপালিত হয়। শয়তানের সামনে প্রবৃত্তির সকল দরজা এবং গোমরাহীর সকল পথ বন্ধ করে দেয়।

৫. পিতা-মাতার জন্য সন্তান হলো উর্বর ভূমি। তারা সেখানে কল্যাণের যে বীজই বপন করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে এর ফসল ভোগ করতে পারবে। সন্তান যখনই কুরআন তিলাওয়াত করবে পিতা-মাতা তার তিলাওয়াতের কারণে উত্তম প্রতিদান লাভ করবে। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ

> ‘আমিই তো মৃতকে জীবিত করি আর লিখে রাখি যা তারা অগ্রে প্রেরণ করে এবং যা পিছনে রেখে যায়। আর প্রতিটি বস্তুকেই আমি সুস্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষণ করে রেখেছি।’ [২১]

সন্তান পরিচর্যার ক্ষেত্রে সালাফদের রীতি ছিল, ছোট বয়সেই সন্তানদেরকে হাফিয বানিয়ে দেয়া।

ইবরাহিম ইবনু সাযীদ আল-আনসারী বলেন, ‘আমি একদিন চার বছর বয়সী একটি বালককে খলিফা মামুনুর রশীদের দরবারে নিয়ে আসতে দেখেছি। সে খলিফার দরবারে কুরআন তিলাওয়াত করলো। কিন্তু সে ক্ষুধার তাড়নায় কান্না শুরু করে দিল।

ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহু বলেন, ‘আমি সাত বছর বয়সে কুরআন মুখস্থ করেছি। আর মুয়াত্বা মুখস্থ করেছি দশ বছর বয়সে।’

কাজী ইস্পাহানী রাহিমাহুল্লাহু বলেন, ‘আমি পাঁচ বছর বয়সে কুরআন মুখস্থ করে ফেলেছি।’

দুই বছর বয়স থেকেই আপনি আপনার শিশুকে সূরা নাস থেকে মুখস্থ

[২১] সুরা ইয়াসিনঃ ১২।

করানো শুরু করে দিতে পারেন। সাথে সাথে সহজভাবে এর ব্যাখ্যাও শুনিয়ে দিবেন। ঐ বয়সে তাকে মুখস্থ করানোর জন্য বিকল্প পন্থাও অবলম্বন করতে পারেন: যেমন—কম্পিউটারে অন্য কারো অথবা আপনার নিজেরই তিলাওয়াত ছেড়ে দিলেন, আর সেটা কয়েকবার করেও হতে পারে। কেননা শিশুরা সাধারণত এই বয়সে এক জায়গায় বসা বা স্থিরতা পছন্দ করে না বরং খেলাধুলার ছলে বিশেষ পদ্ধতিতে শ্রুত বিষয় মুখস্থ করার উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। অনুরূপ আপনার পাশে বসিয়ে খেলার ছলে কোন আয়াত বা সূরা বার বার তাকে শুনাতে পারেন। তাহলে দেখবেন সে অজান্তেই আপনার সাথে বারবার জপে আয়ত্ত করে ফেলবে।

শিশুর বয়স তিন বছর হলে আপনি তার সাথে পুনরাবৃত্তি পঠন পদ্ধতি শুরু করে দিবেন। আর চার বছর হলে তাকে সাথে নিয়ে বসে সহজভাবে কুরআন তিলাওয়াত করবেন। বার বার তার সামনে বলতে থাকুন।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, তা হলো শিশুকে মুখস্থ করানোর কৌশল অবলম্বন করা। এ ব্যাপারে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। এক মা তার সন্তানদের জন্য এমন একটি দোলনা নির্ধারণ করেছে, যার উপর তারা কেবল মুখস্থের সময় এসে বসে। আরেকজন পিতা তার সন্তানকে নিয়ে মুখস্থের সময় বের হতো। তখন তার হাতে হেড ফোনসহ মোবাইলে দিতো। ঘরের প্রয়োজনে বাহিরে যেত। এদিক দিয়ে ছেলেটি তিলাওয়াত শুনত আর কারী সাহেবের তিলাওয়াতের পর সেও বলতে থাকতো। তবে দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসরণ করা এখনকার সময়ে বেশ দুরহ ব্যাপার।

শিশুর বৈশিষ্ট্য চেনার উপায়

বয়সের বিভিন্ন স্তরে শিশুর বৈশিষ্ট্যবলী সম্পর্কে অবগত হওয়া আবশ্যক। এ সময়ে যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

» শিশু—সে কোনো পাত্র নয় যে, আপনি তার মধ্যে ইলম (বিদ্যা)

রাখবেন বরং সে হলো একজন মানুষ। সুতরাং মানসিকভাবে তার প্রস্তুত হওয়া এবং তার থেকে উদ্দেশ্য বস্তু অর্জন করা। যে কোনো কাজে তার পিছনে লেগে থাকা এবং এর জন্য পুরস্কৃত করার গুরুত্ব দেয়াও দরকার। যেন সে সহজেই মুখস্থ করা ও পড়তে বসার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়।

» হিফজ শুরু করার পূর্বেই শিশুর মনে কুরআনের ভালোবাসা তৈরী করার প্রতি গুরুত্ব দেয়া। তাকে কুরআনের প্রতি ভালোবাসা ও কুরআনের সম্মান প্রদর্শন করার ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া। অনুরূভাবে তাকে কুরআন শিক্ষা দেয়ার প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব দেয়া। মানুষের আচরণ, মেধা ও চিন্তার উপরও কুরআনের এক বিরাট প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

» শিশুর যোগ্যতা অনুপাতে সুন্দরতম প্রক্রিয়া গ্রহণ করবেন। কিছু শিশু আছে শ্রবণসম্পন্ন। তারা সুন্দর কণ্ঠ শুনেই মুখস্থ করে ফেলতে পারে। আবার কতক শিশু আছে বাস্তবতাপ্রিয়। আমরা তাকে পড়ার জন্য বিশেষ আকৃতির মাসহাফ (কুরআন শরিফ) দিব। আর কিছু শিশু রয়েছে যারা দৃষ্টিসম্পন্ন। যারা এক পলকে দেখলেই অনায়াসে মুখস্থ করে ফেলে। আমরা তাকে তার মুখস্থ করা আয়াতগুলো দেখাবো। আরেক শ্রেণীর শিশু রয়েছে যারা চঞ্চল প্রকৃতির। আমরা তাকে খেলাধুলার মধ্য দিয়েই মুখস্থ করাবো।

» বর্ণিত আছে, শিশুর মুখস্থকে সুদৃঢ়করণের সময়সীমা হলো দুই মিনিট। সুতরাং যার বয়স চার হবে, তার সুদৃঢ়করণের সময় হলো৷ ৪+২=৬ মিনিট। অর্থাৎ প্রত্যেক ছয় মিনিট পর পুনরাবৃত্তি করতে তার একটু বিশ্রামের প্রয়োজন হবে। ফলে দ্বিতীয়বার মুখস্থ করতে তার এক মিনিট কিংবা দুই মিনিট বিশ্রাম নিতে হবে।

» খেলাধুলা ও আমোদ-ফুর্তি শিশুদের মৌলিক একটি চাহিদা। সুতরাং আপনার শিশুর চাহিদা পূরণের প্রতিবন্ধক যেন কুরআনুল কারিম না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কারণ তখন সে খেলাধুলাকে কুরআনের সাথে তুলনা করবে। এতে দেখা যাবে ধীরে ধীরে সে

কুরআনের পরিবর্তে খেলাধুলার প্রতি অধিক পরিমাণে ঝুঁকে যাবে।

» খেলাধুলা করা আর ভালো বসার পরিবেশে মুখস্থ, শিশুর মনে কুরআনের প্রতি ভালেবাসা জন্মায় এবং তার স্মৃতিপটে কুরআনকে বদ্ধমূল করে রাখে।

» শিশুর উপযোগী বস্তু দ্বারা কুরআন মুখস্থ করানোর নানা মাধ্যম গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন, মুখস্থ করানোর কোনো সফটওয়্যার (অটোমেটেড ওয়ালেট প্রোগ্রাম) ব্যবহার করা অথবা সুন্দর হস্তলিপির মাধ্যমে, শিশু যা বোর্ডে মুখস্থ করেছে তা লেখা এবং তার জন্য বিশেষ একটি জায়গায় রেখে দেয়া কিংবা মুখস্থ হওয়া প্রতিটি অংশের জন্য বিশেষ কিছু দিয়ে গিফট দেয়া অথবা প্রতি মুহূর্তে সে যা মুখস্থ করেছে এর জন্য বোর্ড তৈরী করা।

» মানুষ স্বভাবজাতই বেদনাদায়ক স্মৃতিগুলোর সাথে থাকা বিষয়গুলো ভুলে যায়। যেমন, লজ্জা, শাস্তি, হীনমন্যতার অনুভূতি ইত্যাদি। আপনি চেষ্টা করুন তার মুখস্থের সময়টা যেনো একটা সুন্দর স্মৃতিময় সময় হয়। অর্থাৎ সে যেনো কখনো ভুলে না যায়।

» সন্তানদেরকে দুঃখ-বেদনাগ্রস্থ অবস্থায় কুরআন মুখস্থ করার চাপ না দেয়া। কারণ এটা আপনার সন্তান ও শিক্ষাদানকারী শিক্ষকের মধ্যে একটা দূরত্ব সৃষ্টি করে। যার ফলে সে কুরআন থেকে এবং হাফিয সাহেব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে যায়। সন্তানের মনে সৃষ্টি করে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। আর তা তাকে পুনরায় মুখস্থ করা থেকেও ফিরিয়ে রাখে।

» কুরআনের মান অনুভব করাতে ও তার স্মৃতিপটে বদ্ধমূল করতে সে যা মুখস্থ করে, তা প্রয়োগ করার জন্য সন্তানের প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়া।

» ঘুম ও মুখস্থ করার জন্য রুটিন তৈরী করা। যেন সে মুখস্থ করার সময়ের প্রতি সম্মান দেখায়।

» উপযোগী সময় নির্বাচন করা। যেন তার মস্তিষ্ক প্রানবন্ত ও ফুরফুরে

থাকে। মুখস্থ করার যোগ্যতার সিঁড়িতে যেন সে আরোহণ করতে পারে।

কুরআনুল কারীম আমাদের জীবন

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমি তো প্রেরিত হয়েছি উত্তম চরিত্রে পূর্ণতা দেয়ার জন্য।' [২২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উত্তম চরিত সম্পর্কে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর বক্তব্য নিয়ে যদি আমরা চিন্তা করি (তিনি যখন বললেন, তার চরিত্র হলো কুরআন। তার ক্রোধে তিনি ক্রোধান্বিত হন। তার সন্তুষ্টিতে তিনি সন্তুষ্ট হন।) তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে, চরিত্র শেখার মূল উৎস হলো আল্লাহ তাআলার কালাম। অতএব আমাদের সন্তানদেরকে কুরআন থেকে চরিত্র শিখানো আমাদের উপর আবশ্যক।

সন্তানের বয়স চার বছর হয়ে গেলে, আপনি দৈনন্দিন তার সাথে আল্লাহ তাআলার আয়াতের সাথে সম্পর্ক তৈরী করা শুরু করে দিন। সাথে-সাথে ঐ আয়াতের সাবলীল ব্যাখ্যা করুন। ড. আসমা ইবনুতে সুলাইমান এ বিষয়ে মূল্যবাণ একটি রিসালা (ছোট পুস্তিকা) লিখেছেন। যার শিরোনাম হলো 'কাইফা নুরাব্বী আওলাদানা বিল-কুরআন'। ওখানে তিনি খুব সংক্ষিপ্ত আকারে কয়েকটি পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। তন্মদ্ধে বিশেষ কয়েকটি পদ্ধতি নিম্নরূপ:

» যখন সন্তানরা প্রচণ্ড ভীরের সময় কোনো মজলিসে বসে। আর তার অন্যান্য ভাইয়েরাও খুব আগ্রহ ভরা মন নিয়ে তাদের সাথে বসতে আসে। তখন মা তাদের অন্য ভাইদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করবে। আর তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিবে যে, তাদের এ জন্য রয়েছে প্রতিদান। আল্লাহ তাআলা বলেন—

[২২] আদাবুল মুফরাদঃ ২০৭।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ

> 'হে মুমিনগণ! তোমাদের যখন বলা হয়, মজলিসে স্থান করে দাও, তখন তোমরা স্থান করে দিবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান করে দিবেন।'[২৩]

» সন্তানরা যখন পরস্পর বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়, তখন মা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এই বলে যে, এটা শয়তানের কাজ। সাথে সাথে এ আয়াত তিলাওয়াত করে শুনাবে—

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ

> 'শাইতান শুধু তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করতে চায়।'[২৪]

» যখন সন্তানদের কেউ খেলাধুলা বা পোশাক-আশাক নিয়ে হৈ-হুল্লোর সৃষ্টি করে তখন আপনি তাকে ডেকে মুহাব্বতের সাথে বলবেন, এই মাটি আর পোশাক নিয়ে কি কখনো চিন্তা করেছো? তোমার কি মনে হয়?

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ

> 'নিঃসন্দেহে আমি সংশোধনকারীদের প্রতিদান নষ্ট করবো না।'[২৫]

এই প্রতিদান কে লুফে নিবে? আয়াতটি তার সামনে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করবেন অথবা সহজ ভাষায় এর অর্থ স্পষ্ট করে দিবেন এবং প্রতিদানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবেন। আর ওকে ডেকে বলবেন, এসো! আমরা বিশৃঙ্খলা বন্ধ করে সুষ্ঠ পরিবেশ তৈরী করি। অতএব 'মুসলিহ' (সংশোধনকারী)

---

[২৩] সুরা আল-মুজাদালাহ: ১১।
[২৪] সুরা আল-মায়েদাহ: ৯১।
[২৫] সুরা আ'রাফ: ১৭০।

এই শব্দটি ব্যবহার করবেন। যা আয়াতের এই অংশ الْمُصْلِحِيْنَ থেকে নির্গত। যেন সন্তান এ শব্দটি রপ্ত করে ফেলে।

» শিশু যখন কোনো ভুল করে বা সীমালঙ্গন করে ফেলে, যেমন—সে অনুমতি না নিয়ে রাস্তায় খেলতে গেল কিংবা তার কোনো ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করে মারামারি পর্যায়ে চলে গেল; তখন মায়ের জন্য কর্তব্য হলো—তাকে ক্ষমা করার গুণ শিক্ষা দেয়া। অবশ্য কুরআনের মূলনীতি অনুযায়ী হতে হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

| 'নিশ্চয় নেক আমল বদ আমলকে মিটিয়ে দেয়।' [২৬]

যেন শিশু মন্দ গুণের পরিবর্তে ভালো গুণ অর্জনে অভ্যস্ত হয়। সর্বদা মা তাকে ভালো কোনো কাজ করার জন্য অনুরোধ করবে। তার ভুলের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তার ভেতর ক্ষমা চাওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি করে দিবে। মা খুব জোড় দিয়ে তার সামনে উপরোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করবে।

ঐ পান্ডুলিপিতে আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে। যা প্রতিটি মা-ই তাদের দৈনন্দিন জীবনে অনুসরণ করতে পারে।

মুহাম্মাদ নূর সুয়াইদ তার স্বরচিত গ্রন্থে শিশুদের অন্তরে কুরআনের প্রভাব বিস্তার বিষয়ক চমৎকার একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ইবনু যফর আল-মাক্কী শিশুকে কালেমায়ে শাহাদাত পুনরাবৃত্তি করানো নিয়ে ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, আবু সুলাইমান দাউদ ইবনু নাসীর আত্বতায়ী রাহিমাহুল্লাহু যখন পাঁচ বছর বয়সে উপনীত হলেন। তখন তার পিতা তাকে এক শিক্ষকের কাছে অর্পন করলেন। শিক্ষক মহোদয় তাকে কুরআন শিক্ষা দেয়া শুরু করলেন। তিনি ছিলেন প্রচণ্ড স্মৃতিশক্তির অধিকারী। অতঃপর তিনি সূরা দাহরের প্রথম আয়াত

[২৬] সূরা হুদ: ১১৪।

শিখে মুখস্থও করে ফেললেন। কোনো এক জুমুআর দিন তার মা তাকে হাত দ্বারা ইশারা করতে করতে প্রাচীর অভিমুখী আসতে দেখলেন, তখন তিনি তার সন্তানের বুদ্ধি লোপ পেল কিনা আশংকা করলেন। তাই তাকে ডেকে বললেন, দাউদ, উঠে দাঁড়াও! সন্তানদের সাথে খেলাধুলা করো। সে তার ডাকে কোনো সাড়া দিলো না। তখন তার আম্মু তাকে নিজের সাথে জড়িয়ে ধরে আক্ষেপ প্রকাশ করতে লাগলো।

তখন সে বললো, আম্মু কি হয়েছে তোমার?

তার আম্মু বললো, তোমার সেই স্মৃতিশক্তি কোথায় হারিয়ে গেল?

সে বললো, আল্লাহ তাআলার বান্দাদের সাথে আছে।

আম্মু বললো, তারা কোথায়?

সে উত্তর দিল, জান্নাতে।

আম্মু বললো, তারা কি করে?

সে বললো—

مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا

> ‘তারা সেখানে সুউচ্চ আসনে হেলান দিয়ে আসীন থাকবে। তারা সেখানে না দেখবে অতিশয় গরম, আর না অত্যাধিক শীত।’ [২৭]

অতঃপর সে ঐ সূরার দিকে ইশারা করে চললো, যেনো সে কোনো কিছু চিন্তা করছে। অবশেষে

إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا

> ‘এটিই তোমাদের পুরস্কার, আর তোমাদের প্রচেষ্টা ছিল

[২৭] সুরা দাহর: ১৩।

প্রশংসাযোগ্য।'[২৮]

এ আয়াত পর্যন্ত যখন সে পৌঁছলো তখন সে বললো, আম্মু! তাদের চেষ্টা কি ছিল বলতে পারো?

তার আম্মু কোনো উত্তর দিতে পারলো না। ফলে সে তার আম্মুকে বললো, আমার থেকে চলে যাও। আমি কিছুক্ষণ তাদের কাছে অবস্থান করে আনন্দ উপভোগ করবো।

তার আম্মু চলে গেল। অতঃপর তার আম্মু তার পিতার কাছে গিয়ে তার ছেলের এ অবস্থার কথা জানালো। তখন তার পিতা তাকে বললো, তাদের চেষ্টা হলো এ কথা বলা যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার রাসূল'। এরপর থেকে অধিকাংশ সময় সে এ কালিমা পাঠ করত।

মাসনূন দু'আসমূহ শিক্ষা দেয়া

আপনার শিশু বড় হতে চলেছে। দুগ্ধপানকালীন আপনার মুখ থেকে শুনে যেসব দু'আ সে মুখস্থ করেছে; এখন সময় এসেছে আরো কিছু দু'আ মুখস্থ করিয়ে দেয়া এবং এর অর্থ বুঝিয়ে দেয়া, সাথে সাথে এর সওয়াব ও প্রতিদানের কথা জানিয়ে দেয়া; যেন সে এগুলো মেনে চলার প্রতি উদ্বুদ্ধ হতে পারে। যেমনটি আমাদের সালাফগণ করতেন।

লোকমান হাকিম থেকে বর্ণিত, একবার তিনি তার ছেলেকে লক্ষ্য করে বললেন, বেটা! বেশি বেশি 'রাব্বিগফির-লী' পড়ো। কেননা আল্লাহ তাআলার এমন কিছু মুহূর্ত আছে যেখানে কাউকে ফেরত দেয়া হয় না।

সন্তানদেরকে মাসনূন দু'আ শিখানোর গুরুত্ব দেয়ার ব্যাপারে শাইখ সালেহ ইবনু উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহু বলেন, সন্তানদেরকে দলিলসহ আহকাম শিক্ষা দেয়া উচিত। যেমন—আপনি আপনার সন্তানকে বলবেন, খাবারের সময় 'বিসমিল্লাহ' বলো। খাবার শেষ করে 'আলহামদুলিল্লাহ'

[২৮] সূরা দাহর: ২২।

বলো। শুধুমাত্র এ কথার দ্বারাই কিন্তু উদ্দেশ্য অর্জন হয়ে যায়। তবে যদি আপনি বলেন, খাবার সময় বিসমিল্লাহ বলো। খাবার শেষ করে আলহামদুলিল্লাহ বলো। কেননা নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাবারের সময় বিসমিল্লাহ বলার নির্দেশ দিয়েছেন। এবং বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন যখন বান্দা খাবার খেয়ে প্রশংসা করে। এবং প্রশংসা করে পানি পান করে। আপনি যখন এই কাজটি করবেন তখন আপনার দু'টি লাভ অর্জন হবে।

প্রথমত: আপনার সন্তানকে কোন বিষয়ে দালীলীকভাবে জানতে অভ্যস্ত করা।

দ্বিতীয়ত: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি মুহাব্বত ও ভালোবাসার উপর পরিচর্যা করা। কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই হলেন একমাত্র অনুসরণীয় ব্যক্তি; যার দিকনির্দেশনা গ্রহণ করা আবশ্যক।

বাস্তব কথা কি জানেন? এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা অধিকাংশ মানুষই উদাসীন। অধিকাংশ লোক সন্তানকে আহকাম শিখানোর প্রতি নির্দেশনা দেয়। কিন্তু এই নির্দেশনাকে তার উৎস তথা কুরআন ও সুন্নাহকে সম্পৃক্ত করে দেয় না।

মাসনূন দু'আর কিছু দৃষ্টান্ত

শৌচাগারে প্রবেশ করা ও বের হওয়ার সময়

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন শৌচাগারে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন—

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আয়ুযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খবায়েছ' [২৯]

---

[২৯] আস সহিহ, ইমাম মুসলিম: ৩৭৫।

> "হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে পানাহ চাই, পুরুষ শাইতান ও নারী শাইতান থেকে।"

আর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শৌচাগার থেকে বের হতেন তখন বলতেন, "গুফরানাকা"।[৩০] অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

ঘরে প্রবেশ করার সময়

ঘরে প্রবেশ করার সময় আমরা তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা স্মরণ করিয়ে দিব।

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা খয়রল মাওলিজি ওয়া খয়রাল মাখরাজি, বিসমিল্লাহি ওয়ালাজনা ওয়া বিসমিল্লাহি খারাজনা ওয়া আলাল্লাহি তাওয়াক্কালনা'।[৩১]

> 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ঘরে প্রবেশ ও ঘর থেকে বের হওয়ার কল্যাণ চাই। আপনার নামেই আমি প্রবেশ করি ও বের হই। হে আমাদের রব! আমরা আপনার উপরই ভরসা করি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ বাণীর কারণে যখন কোনো ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশ করে। অতঃপর ঘরে প্রবেশের এবং খাবার গ্রহণের সময় আল্লাহ তাআলার নাম স্মরণ করে, তখন শাইতান হতাশ হয়ে (তার সঙ্গীদের) বলে, তোমাদের এখন রাত্রী যাপনের ব্যবস্থাও নেই, খাওয়ার ব্যবস্থাও নেই। আর যখন সে খাবারের সময় আল্লাহ তাআলার নাম স্মরণ না করে, তখন শাইতান বলে, তোমাদের নিশি যাপন ও রাতের খাবরের আয়োজন হলো।[৩২]

অপ্রীতিকর কোনো কিছু ঘটার সময়

যখন অপ্রীতিকর কোনো কিছু ঘটবে বা কোনো কাজে পরাভূত হবেন

[৩০] আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ৭।
[৩১] সুনানু আবি দাউদ: ৫০৯৬।
[৩২] আস সহিহ, ইমাম মুসলিম: ২০১৮।

তখন বলবেন, 'আল্লাহ তাআলা যা নির্দিষ্ট করেছেন এবং যা চেয়েছেন তাই করেছেন'। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, শক্তিধর ঈমানদার দুর্বল ঈমানদারের তুলনায় আল্লাহ তাআলার নিকট অধিক উত্তম ও পছন্দনীয়। তবে প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত আছে। যেন তোমার উপকার রয়েছে তা অর্জনে তুমি আগ্রহী হও এবং আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য কামনা কর। তুমি অক্ষম হয়ে যেয়ো না। যদি তোমার উপর কোনো মুসীবত আসে তাহলে এমন বলো না যে, যদি আমি এমন এমন করতাম তবে এমন হতো না। বরং এ কথা বলো যে, 'আল্লাহ তাআলা যা নির্দিষ্ট করেছেন এবং যা চেয়েছেন তাই করেছেন' কেননা 'যদি' শব্দটি শয়তানের দুয়ার খুলে দেয়।[৩৩]

তাকে আল্লাহ তাআলার যিকিরের জন্য উদ্বুদ্ধ করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লহি ওয়া বিহামদিহী' একশত বার পড়বে, তার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়।' [৩৪]

খেলাধুলা ও আনন্দ-ফুর্তি করার সময়ও তাকে এই তাসবীহগুলো শিক্ষা দিতে পারেন। আবদুল্লাহ ইবনু আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আমরা একবার এক যাত্রায় আমাদের পিতার সাথে সফররত ছিলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, আমরা ঐ গাছ পর্যন্ত যেতে যেতে তোমরা সুবাহনাল্লাহ বলো। তখন আমরা সকলেই ঐ গাছ পর্যন্ত পৌঁছাতে পৌঁছাতে 'সুবহানাল্লাহ' বলতে লাগলাম। এরপর যখন আরেকটি গাছ দেখা গেল তখন তিনি বললেন, ঐ যে গাছটি দেখা যাচ্ছে এর সামনে পৌঁছানো পর্যন্ত 'আল্লাহু আকবর' বলো। আমরা আল্লাহু আকবর বলতে থাকলাম। এভাবে তিনি আমাদের সাথে এমন করতেই থাকলেন।

ঘুমের পূর্বে শিক্ষণীয় গল্প শোনানো

[৩৩] আস সহিহ, ইমাম মুসলিম: ২৬৬৪।
[৩৪] আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ৬৪০৫।

পরিচর্যার গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম হলো গল্প। গল্প বলার মাধ্যমে পরিচর্যা করা যায়। দিনের বেলা অথবা যে কোনা সময়ই গল্প বলা যায়। তবে ঘুমের পূর্বে এবং মাসনূন দু'আর পর গল্প বলা বেশি কার্যকর। সময়টি অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর ও আকর্ষণীয়। এতে মায়ের সাথে সন্তানের অতিরিক্ত একটা সম্পর্ক ও বন্ধন তৈরী হয়। তাছাড়া ঘুমের সময় গল্প বলা শিশুকে ঘুমের জন্য প্রস্তুত করতে সহায়তা করে। শিশুর মানসিক বিকাশ ঘটায়। তার কল্পনা ও সৃজনশীলতাকে প্রাণবন্ত করে তুলে। শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠন, চরিত্র ও ধর্মীয় মূল্যবোধ তৈরী করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে উত্তম গল্পকে বিবেচনা করা হয়। জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, ঘটনাবলী হলো আল্লাহ তাআলার সৈন্য। এর দ্বারা মুরীদদের অন্তর শক্তিশালী হয়। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনার কাছে কি এর কোনো প্রমাণ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আল্লাহ তায়লার বাণী—

.وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ

> 'আর রাসূলদের এ সকল সংবাদ আমি তোমাদের কাছে বর্ণনা করছি যার দ্বারা আমি তোমাদের মনকে স্থির করি, আর এতে তোমার কাছে সত্য এবং মুমিনদের জন্য উপদেশ ও স্মরণ।' [৩৫]

অতএব, শিশুর দুই বছর বয়স হলেই ঘুমের পূর্বে সহজ সরল শব্দে গল্প বলা শুরু করুন। দশ মিনিটের বেশি সময় নিবেন না। যেন এর মধ্য দিয়েই তার কিছু কিছু শিষ্টাচার শেখা হয়ে যায়।

» শিশুর বয়স তিন বা চার বছর হলে তাকে নবিদের ঘটনা শুনানো শুরু করুন। যেন এর দ্বারা সে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ, নিদর্শনাবলী, কুদরত ও মহানুভবতার ব্যাপারে পরিচয় লাভ করতে পারে। কাফিরদের বিরুদ্ধে নবিদের দাওয়াত, সাহায্য ও ধৈর্য সম্পর্কেও অবগত হতে পারবে।

---

[৩৫] সুরা হুদ: ১২০।

» এরপর আমাদের প্রিয় নবির সীরাত শুনান। যেন নবিজির প্রতি শিশুর আগ্রহ তৈরী হয়। নবি কে? তার আদর্শ কী তা জানতে যেন সে অনুরাগী হয়। তাছাড়া নিয়মিত যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে শুনতে থাকবে এবং তার আখলাক অনুসরণ করবে তখন সে তার সম্পর্কে, মুসলমানদের কৃতিত্ব ও ফযিলত এবং ইসলামের উদারতা ও সহনশীলতা সম্পর্কেও জানতে পারবে।

» তারপর আস্তে আস্তে সাহাবা, খুলাফায়ে রাশেদীন, উম্মাহাতুল মু'মিনীন, নারী সাহাবি ও তাবেয়ীদের জীবন কাহিনী শুনাবে।

ইবাদতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা

এখানে আলোচনা হবে নামায, রোযা, সাদকাহ ইত্যাদি নিয়ে।

নামায

আলহামদুলিল্লাহ, নামায ইসলামি বিষয় সমূহ থেকে সবচে গুরুত্ব বিষয়। এ বিষয়টি কতই না সুন্দর! নামায পড়ার ক্ষেত্রে আপনার অনুকরণ করাই আপনার ছেলের অভ্যাসে পরিণত হবে। সে দেখবে, নামযের সাথে আপনার ভালোবাসা, সম্পর্ক এবং আরাম ও প্রশান্তি উপলব্ধি করতে। ফলে তার অন্তরে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্কের এক অটুট বন্ধন সৃষ্টি হবে। আর এটা তখনই হবে, যখন সে নামাযের সাথে আপনার সম্পর্ক ও ভালোবাসা অনুভব করবে। আপনি তার কানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী শুনাবেন। হে বেলাল! নামায কায়েম করো। আমাদের প্রশান্তি দাও।[৩৬] অনুরূপভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নামাযের মধ্যে আমাকে চোখের শীতলতা দান করা হয়েছে।'[৩৭]

এসব অবস্থা প্রত্যক্ষ করে সন্তান পরিচর্যা লাভ করবে যে, নামাযই হলো

[৩৬] সুনানু আবি দাউদ: ৪৯৮৫।
[৩৭] সুনানে নাসায়ী: ৩৯৪৯।

দুশ্চিন্তা দূর করার মাধ্যম এবং আরাম ও প্রশান্তি লাভের সর্বোত্তম উৎস। কেনইবা হবে না! অথচ তা আল্লাহ ও আমাদের মাঝে সম্পর্ক তৈরী হওয়ার যোগসূত্র।

সালাফে সালেহগণ সন্তানদেরকে ছোট সময় থেকেই নামাযের প্রতি অভ্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে গুরুত্ব দিতেন। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—তোমরা তোমাদের সন্তানদের নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হও। তাদেরকে কল্যাণকর কাজে অভ্যস্ত কর। কেননা কল্যাণ অভ্যাসে পরিণত হবে।

মুহাম্মদ ইবনু নাসর আল-মারওয়াযী রাহিমাহুল্লাহু এই হাদিসের উপর মন্তব্য করে বলেন, উপরোক্ত হাদিস থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সন্তানদেরকে ছোট সময় থেকেই নামাযের নির্দেশ দেয়া। যেন তারা নামাযে অভ্যস্ত হয়। বড় হয়ে যেন নামায নষ্ট না করে। নামায ফরয হওয়ার পূর্বেই যদি তারা নামাযে অভ্যস্ত হয়, তাহলে নামায ফরয হলে নামযের প্রতি গুরুত্ব দেয়া তাদের জন্য সহজ হবে।

ইবনু সিরীন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সন্তানরা যখন ডান-বাম পার্থক্য করা বুঝে, তখন থেকেই তাকে নামায শেখানো।

আবু মুআবিয়া হিশাম থেকে সনদে বর্ণনা করেন যে, তার সন্তানেরো যখন বুদ্ধিসম্পন্ন হয়েছে, তখন থেকেই তিনি তাদেরকে নামায শিক্ষা দেন।

অতএব, শিশু যখন হামাগুড়ি দেয়া শুরু করবে, তখন তাকে আপনি দেখতে পাবেন যে, সে নামাযের মধ্যে আপনার আশেপাশে ঘুরে বেড়াবে। তারপর আপনার পিঠের উপর বসার চেষ্টা করবে এই মনে করে যে, আপনি তার সাথে খেলা করবেন। এটা তার কাছে আরো পরিষ্কার হবে; যখন সে আপনাকে দেখবে আপনি রুকু-সিজদা করছেন। কিছুক্ষণ পর সে আবার আপনার অনুকরণ করবে, আপনার পাশে এসে দাঁড়াবে। যখন সে নামাযের সাথে আপনার অবিচলতা ও সম্পৃক্ততা দেখতে পাবে।

শাদ্দাদ রাহিমাহুল্লাহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ইশার নামাযে

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের দিকে বেরিয়ে আসলেন। তখন তিনি হাসান অথবা হুসাইনকে বহন করে আনছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামনে অগ্রসর হয়ে তাকে রেখে দিলেন। তারপর নামযের জন্য তাকবীর দিলেন এবং নামায আদায় করলেন। নামযের মধ্যে লম্বা একটা সিজদা করলেন। রাবী বলেন, আমি আমার মাথা উঠালাম এবং দেখলাম, ঐ ছেলেটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিঠের উপরে রয়েছে। এমতাবস্থায় তিনি সিজদারত। তারপর আমরা সিজদায় গেলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায শেষ করলে লোকেরা বললো, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি আপনার নামাযের মধ্যে একটি সিজদা এত লম্বা করলেন, যেন আমরা ধারণা করলাম, হয়তো কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে অথবা আপনার উপর ওহী নাযিল হয়েছে। তিনি বললেন, এর কোনোটাই না। বরং আমার এ সন্তান আমাকে সওয়ারি বানিয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠতে অপছন্দ করলাম, যেন সে তার কাজ সমাধা করতে পারে।[৩৮]

উপরোক্ত হাদিস থেকে বুঝা গেল যে, সন্তানদেরকে এই সময়টাতে সঙ্গে করে মসজিদে নিয়ে যাওয়া। যেন তারা সুন্দরভাবে নামায আদায় করা শিখতে পারে এবং তাদের মাঝে মসজিদের গুরুত্ব ও মাহাত্ম লক্ষ্য করা যায়। কেননা এটা তার মধ্যে জামাতে নামায আদায় করার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সহায়ক হবে।

সিয়াম

সালাফগণ যেমন তাদের সন্তানদেরকে নামায শিক্ষা দেয়ার প্রতি গুরুত্ব দিতেন, তেমনি গুরুত্ব দিতেন অন্যান্য সকল ইবাদাত করার উপর অভ্যস্ত করার প্রতি। যেমন, বিশেষ একটি ইবাদত রোযা। ইবনু মুনযির রাহিমাহুল্লাহু বলেন, সন্তান যখন ভালো কাজ করার সক্ষমতা লাভ করে, তখনই তাকে রোযা রাখার নির্দেশ দেয়া উচিত।

হিশাম ইবনু উরওয়া থেকে বর্ণিত, তিনি তার সন্তানদেরকে রোযা রাখার

[৩৮] আস সুনান, ইমাম নাসাঈ: হাদিস নং ১১৪০।

নির্দেশ দিতেন যখন তাদের কেউ রোযা পালনের সক্ষমতা লাভ করতো। আর নামাযের নির্দেশ দিতেন যখন সে বিবেক সম্পন্ন হতো।

সাহাবাগণ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং সালাফগণ তাদের সন্তানদেরকে নফল রোযা রাখার ব্যাপারে সহযোগিতা করতেন, যার ফলে রমজান মাস আসলে তারা কোনো প্রকার কষ্ট ও ক্লান্তি ছাড়াই রোযা রাখত।

রুবায়্যি বিনতে মুআব্বিয ইবনু আফরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আশুরার সকালে আল্লাহ তাআলার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারদের সকল পল্লীতে এ নির্দেশ দিলেন: যে ব্যক্তি রোযা পালন করেনি সে যেন দিনের বাকী অংশ না খেয়ে থাকে। আর যার রোযা অবস্থায় সকাল হয়েছে, সে যেন রোযা পূর্ণ করে। তিনি (রুবায়্যি) বলেন, পরবর্তীতে আমরা ঐ দিন রোযা পালন করতাম এবং আমাদের শিশুদেরকে দিয়ে রোযা পালন করাতাম। আমরা তাদের জন্য পশমের খেলনা তৈরী করে দিতাম। তাদের কেউ খাবারের জন্য কাঁদলে তাকে ঐ খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতাম। আর এভাবেই ইফতারের সময় হয়ে যেত।[৩৯]

কতই না সুন্দর পদ্ধতি যে, আপনি তাদেরকে ধীরে ধীরে রমজানের তিন মাস বা তার আগ থেকেই রোযা রাখার প্রতি উৎসাহিত করবেন। তারা সপ্তাহের সোম, মঙ্গলবার রোযা রাখবে। শুরুতে তাদের রোযা হবে যোহর পর্যন্ত। তারপর আছর পর্যন্ত। এরপর মাগরিব পর্যন্ত। রমজান মাস আসার সাথে সাথে তারা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় ও তাওফীকে পরিপূর্ণভাবে রোযা রাখার যোগ্যতা অর্জন করে ফেলবে। এই উদ্বুদ্ধকরণের পাশাপাশি তাদেরকে পুরস্কার দেয়ারও ব্যবস্থা করবেন।

শরয়ি ইলম শিক্ষা দেয়া

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

---

[৩৯] আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ১৯৬০।

> ‘বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে।’ [৪০]

ইমাম সা’দী রাহিমাহুল্লাহু এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন—আল্লাহ তাআলার প্রতি যার যত বেশি ইলম অর্জন হবে, সে আল্লাহকে ততবেশি ভয় করবে। আর আল্লাহ তাআলার ভয় অর্জনের জন্য আবশ্যক হলো সব ধরনের গুনাহ থেকে মুক্ত থাকা। যাকে ভয় করা হয়, তার সাক্ষাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

ইলমের ফযিলতের এটিই হলো শক্তিশালী দলিল। কেননা সে আল্লাহ তাআলার ভয়ের দিকে আহ্বানকারী। আর ভয়কারীরাই সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ

> ‘আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন তারাও আল্লাহ তাআলার উপর সন্তুষ্ট হয়েছে। এটি তঁর জন্য, যে স্বীয় রবকে ভয় করে।’ [৪১]

এ আয়াতের মধ্যে ইলমের গুরুত্বের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এবং মানুষের আকীদা-বিশ্বাস ও স্বভাব-চরিত্রের জন্যও নির্দেশনা রয়েছে। এ জন্য আমাদের উপর আবশ্যক হলো আমাদের সন্তানদেরকে ছোট সময় থেকেই ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেয়া। যেন সে আল্লাহ তাআলার ভয় নিয়েই বেড়ে উঠতে পারে।

সন্তানদেরকে শরয়ি ইলম শিক্ষা দেয়ার দু’টি পদ্ধতি রয়েছে

» মায়ের যদি উদ্দেশ্য থাকে সন্তানকে শরয়ি বিষয়ক জ্ঞানের অধিকারী বানানো; তাহলে তার কর্তব্য হলো, প্রথমেই তাকে কুরআনের হাফিয বানানো। তারপর সে ইতিমধ্যে যা শিখে নিয়েছে সেগুলো বাদ দিয়ে তাকে মতন তথা মূল পাঠ মুখস্থ করানো। সময়ের সাথে সাথে এর দ্বারা তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। এবং তারা যে মতন ও তাফসির

[৪০] সুরা ফাত্বির: ২৮।
[৪১] সুরা আল-বাইয়্যেনাহ: ৮।

শাস্ত্র মুখস্থ করে সংরক্ষণ করেছে, এটাও তারা বুঝতে পারবে।

» আর যদি তার উদ্দেশ্য হয় আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্কীয় একটি প্রজন্ম আবিষ্কার করা; তাহলে তার উপর আবশ্যক হলো—তাকে কুরআন শিক্ষা দেয়া। এর সাথে সাথে তাকে শরিয়তের জ্ঞানসমূহের প্রতিটি শাখায় মৌলিক শিক্ষা দেয়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া। যেমন, সে সপ্তাহে কমপক্ষে একটি পাঠ গ্রহণ করবে। সেই পাঠটি পনের মিনিট সময়ের মধ্যে হতে হবে। প্রতিটা পাঠ যেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। এই পাঠ শেষ হওয়ার পর উলুমে শরইয়্যার আরেকটি শাখার পাঠ পড়ানো শুরু করা।

শরয়ি জ্ঞান কয়েক ভাগে বিভক্ত

আকীদাহ

এ শাস্ত্রে সে শিখবে আল্লাহ তাআলার প্রভুত্ব, একত্ববাদ, নাম ও গুণাবলী এবং ফেরেশতা, কিতাব, নবি-রাসুল, শেষ দিবস ও ভালো-মন্দ তাকদীরের উপর বিশ্বাস। মোটকথা গায়েবের প্রমাণিত যত বিষয় আছে এবং দ্বীন-ইসলামের মূলনীতিমালা ও সালাফদের সর্বসম্মত সকল মাসআলা সে শিখে নিবে। উপরন্তু হুকুম-আহকাম ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলাকে পূর্ণ মেনে নেয়া এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিপূর্ণ অনুসরণ করার বিষয়টিও শিখে নেয়া।

হাদিস

এ শাস্ত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উক্তি ও কাজ অর্থসহ শিখে নেয়া। যেন সে তার জীবনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ-অনুকরণ করে বাস্তবায়ন করতে পারে।

ফিকহ্

এ শাস্ত্রে শিখবে, তাহারাতের আহকাম। যেমন—ইস্তেঞ্জা, অযু ও অযু ভঙ্গের কারণ ইত্যাদি।

নামাযের আহকাম, পদ্ধতি ও নামায নষ্ট হওয়ার কারণ। অনুরূপভাবে রোযা ও তার আহকাম। মোটকথা একজন মানুষের দৈনন্দিন জীবনে চলতে হলে যেসব ফিকহী মাসআলা জানার প্রয়োজন সেগুলো সব শিখে ফেলা।

তাফসির

এ শাস্ত্র থেকে শিখবে, আল্লাহ তাআলার আয়াত নিয়ে গবেষণা করা, কুরআনের সাথে এর কি সম্পর্ক, বাস্তব জীবনের সাথে এর সম্পর্ক আছে কিনা এবং হালাল-হারাম জানা ও আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক এবং নৈকট্য অর্জনের বিষয়।

মহৎ চরিত্রাবলী

এ শাস্ত্রে থাকবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে, কুরআনের সাথে, মুমিনদের সাথে এবং মুশরিকদের সঙ্গে ও তাদের প্রতিবেশীদের সাথে আল্লাহ তাআলার কেমন আচরণ হয়েছিল। যেন তোমার সন্তান প্রতিটি অঙ্গনে তার অনুসরণ করে চলতে পারে।

ইসলামী শিষ্টচার সমূহ

আল্লাহ তাআলার সাথে বান্দার শিষ্টাচার, কুরআন, নবি-রাসুল, সাহাবা, পরিবার-পরিজন ও অন্যান্য লোকজনের সাথে কেমন শিষ্টাচার হওয়া উচিত এ জাতীয় যেসব বিষয় আছে, যেগুলোর প্রতি ইসলাম আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে সেগুলো শেখা। যেমন অনুমতি নেয়া, খাবার খাওয়া, ঘুমানো ও কথা বলার শিষ্টাচার এ জাতীয় আরো যা কিছু আছে।

জীবন-বৃত্তান্ত

নবি-রাসুলদের ঘটনাবলী। যার মাধ্যমে সে জানতে পারবে তাদের নাম, মু'জিযা ও তাদের কওমকে তাওহিদের দাওয়াত দেয়ার পদ্ধতি। বিশেষভাবে আমাদের প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন-চরিত। এখানে সে জানতে পারবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম এর পরিচয়। তার শৈশব। নবুওয়াত লাভের জন্য কষ্ট করা এবং শিশু, মুমিন ও কাফেরদের সঙ্গে তার বিভিন্ন আচার-ব্যবহার। সাহাবী, উম্মাহাতুল মুমিনীন, তাবেঈ, তাবে তাবেঈনদের ঘটনাও সে জানতে পারবে।

আরবী ভাষা

এ শাস্ত্রে সে শিখবে, হরফের উচ্চারণ, হরকত, মাদ্-সাকিন, তাশদীদ, লামে শামছিয়্যা, লামে ক্বমারিয়্যা ইত্যাদি। এরপর তাজভীদের নিয়ম অনুযায়ী ছোট ছোট সূরা থেকেই আল্লাহ তাআলার কিতাব পাঠ করা শুরু করবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিদ্যালয়ে যাওয়ার স্তর (ছয় থেকে তদুর্ধ্ব)

বিদ্যালয়ে যাওয়ার স্তর (ছয় থেকে তদুর্ধ্ব)

এ স্তর হলো শিশুকে ঘিরে সামাজিক পরিবেশের বিস্তার। এবং তার অস্তিত্ব প্রমাণ করা ও অন্যান্যদের সাথে তার আচরণের ক্ষেত্রে দৃঢ় বিশ্বাস প্রদর্শনের চেষ্টা করা। এখানে পূর্ববর্তী বছরগুলোতে আপনি যা শিখিয়েছেন এবং সে তার আশপাশের লোকজন থেকে যা শিখেছে এর মধ্যে কী কী অসংগতি আছে সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা। বিশেষত যখন সে তার চেয়ে নিম্ন শ্রেনীর লোক বা ব্যক্তিত্বের দিক থেকে একেবারেই নগণ্য তাদের সাথে মিশতে বাধ্য হয়। এখানে আপনার দায়িত্ব হলো তার বোধগম্যতা, আলোচনা, কথোপকথন ও আয়ত্বকরণের ভিত্তিতে শরয়ি ইলমের অধ্যায়নকে আরো প্রসারিত করা। আল্লাহ তাআলার প্রতি তার দৃঢ় বিশ্বাসকে আরো সংহতিকরণের জন্য সে যেন তার চারপাশের লোকজনের মধ্যে বেশি প্রভাবশালী হয়। প্রভাবিত যেন না হয়। আপনি আপনার সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করবেন।

তাওহিদ ও ঈমান শিখানোর নতুন মাধ্যম গ্রহণ

শিক্ষার মাধ্যমে বৈচিত্রের প্রতি আগ্রহ; শিশুর তথ্য সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ মাধ্যম গ্রহণ করাটা আপনার সন্তানের ব্যক্তিত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করবে। নতুনত্ব ও প্রাধান্যের বিষয় হিসেবে

মাধ্যমগুলোর মাঝে প্রতিটি সময়কালের বৈচিত্রকরণের সাথে এর প্রতিক্রিয়া কতটুকু সেটাও ভেবে দেখা।

দিকনির্দেশনার ক্ষেত্রে এ মাধ্যমগুলোর যেমন ভূমিকা রয়েছে, তেমনিভাবে সন্তানের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টিকারী উপযুক্ত সময় গ্রহণ করার মাঝেও এর যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। কেননা মানুষের মন ক্ষণে-ক্ষণে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। সে হিসেবে পিতা-মাতার জন্য আবশ্যক হলো এমন একটা সময় নির্বাচন করা যে সময়ে সন্তানের অন্তর উপদেশ গ্রহণের জন্য উন্মুখ থাকে। আর সেটাই হলো সন্তানদের অন্তর পরিবর্তনের সময়।

» বিনোদন, রাস্তা-ঘাট ও গাড়িতে আরোহণ। মুক্ত বাতাসে খোলামেলা জায়গায় তার মন যে কোনো জিনিস গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকে।

» অসুস্থতার সময়। অসুস্থতা বড়দের হৃদয়কেও নরম করে দেয়। শিশু অবস্থায় তো আরো বেশি নরম থাকে। যার ফলে এটা উপদেশ ও দিকনির্দেশনা গ্রহণের মোক্ষম সুযোগ হয়। অবশ্য এই দিকনির্দেশনাটি হতে হবে ভালোবাসা, নম্রতা ও কোমলতার মাধ্যমে। এখানে থাকবে না কোন তিরস্কার, হিসাব ও শাস্তির বাধ্যবাধকতা।

এ সবকিছু হবে তার ভিতরে অনুভূতি সৃষ্টি করার মাধ্যমে এবং তার মনোযোগ আকর্ষণের মাধ্যমে। তবে এর শুরুটা হতে হবে ভালোবাসা মিশ্রিত শব্দ দ্বারা। যেমন বললে, আব্বু!, নয়ন তারা! কলিজা আমার!।

শিক্ষার নানা মাধ্যম

শিশুর সঙ্গ গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া

মুহাম্মদ নুরুদ্দীন সুয়াইদ বলেন—সঙ্গ শিশুমনে প্রভাব ফেলার বিরাট ভূমিকা রাখে। কারণ সঙ্গ হলো, বন্ধু বন্ধুর আয়না স্বরূপ। ফলে একে অপরের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। তিনি আরো বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাঠে-ঘাটে সন্তানদেরকে সঙ্গ দিতেন। কখনো ইবনু আব্বাসকে সঙ্গ দিয়ে এক সাথে রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন। কখনো

চাচাতো ভাই শিশু জা'ফরকে সঙ্গ দিতেন। আবার কখনো খাদেম আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সঙ্গ দিতেন। এভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনোরকম অসন্তোষ প্রকাশ করা ছাড়াই শিশুদেরকে সময় দিতেন। বড়দের সঙ্গ লাভ করা, এটা শিশুর অধিকার। যেন সে তার থেকে ভালো কিছু শিখে নিজেকে গঠন করতে পারে। তার বুদ্ধি পরিপক্ক হয় এবং তার অভ্যাস সুন্দর হয়।

শিশুর সাথে একত্র হওয়ার সময় শিক্ষা দেয়া

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আমি একদিন (সওয়ারির উপর) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পিছনে ছিলাম। তখন তিনি বললেন, ওহে কিশোর! আমি তোমাকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা শিক্ষা দিব? (তুমি সেগুলো স্মরণ রেখ) তুমি আল্লাহ তাআলার বিধান সমূহ সংরক্ষণ কর তাহলে আল্লাহও তোমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। তুমি (আল্লাহ তাআলার অধিকার সমূহ) স্মরণ রেখ, তাহলে তুমি তাকে সম্মুখে পাবে। যখন তুমি চাইবে, তখন তা আল্লাহ তাআলার কাছেই চাও। আর যখন তুমি প্রার্থনা করবে, তখন একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। আর এ কথা জেনে রেখো যে, যদি সমগ্র জাতি মিলে তোমার উপকার করার জন্য একত্রিত হয়, তবে ততটুকু উপকারই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার তাকদীরে লিখে রেখেছেন। আর তারা যদি তোমার ক্ষতি সাধন করার জন্য একত্রিত হয়ে যায়, তবে ততটুকু ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার তাকদীরে লিখে রেখেছেন। কলমসমূহ উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং খাতাসমূহ (তাকদীরের লিপি) শুকিয়ে গেছে।'[১]

কথোপকথন ও আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান

আমের ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি আমার পিতার নিকট আসলাম।

[১] আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ২৫১৬।

তিনি বললেন, কোথায় ছিলে? আমি বললাম, আমি এমন কিছু লোকদেরকে দেখেছি, যাদের থেকে ভালো লোক আমি আর কখনো দেখিনি। তারা আল্লাহ তাআলার যিকির করলে তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ আল্লাহ তাআলার ভয়ে বেহুঁশ হয়ে যায়। তাই আমি তাদের সাথে বসেছিলাম।

তখন তার পিতা বললো, এর পর থেকে আর কখনো তাদের সাথে বসবে না। তিনি দেখলেন, তার এই কথায় আমার মধ্যে কোনো প্রভাব পড়েনি। অতঃপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কুরআন তিলাওয়াত করতে দেখেছি। আরো দেখেছি আবু বকর এবং উমরকে তিলাওয়াত করতে। তাদের তো কখনো এ রকম অবস্থা হতো না। আবু বকর ও উমরের থেকে তুমি আল্লাহ তাআলার প্রতি বিনয়াবত আর কাকে দেখো?

এই কথা বলার সাথে সাথে আমি প্রত্যক্ষ করলাম এটা আমার ভিতরে চরম প্রভাব ফেলেছে। ফলে আমি তাদেরকে ছেড়ে দেয়েছি। অর্থাৎ তিনি মনে করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদীনের চেয়ে আল্লাহকে অধিক ভয়কারী আর কেউ নেই। কাজেই তাদের এই কর্মকাণ্ড দ্বারা প্রভাবিত হওয়া যাবে না এবং তাদেরকে অনুসরণও করা যাবে না।

ঘটনার মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া

হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি তার নিজের চাদরকে বালিশ বানিয়ে কা'বা গৃহের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন। আমরা মুশরিকদের পক্ষ হতে কঠিন নির্যাতন ভোগ করছিলাম। তাই আমি বললাম, আপনি কি আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করবেন না? তখন তিনি উঠে বসলেন এবং তার চেহেরা লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন, তোমাদের পূর্বের ঈমানদারদের মধ্যে কারো কারো শরীরের হাড় পর্যন্ত সব গোশত ও শিরা-উপশিরাগুলি লোহার চিরুণী দিয়ে আঁচড়ে বের করে ফেলা হতো। এতদসত্বেও জালেমরা তাদেরকে

দ্বীন হতে বিমুখ করতে পারত না। তাদের মধ্যে কারো মাথার মাঝখানে করাত রেখে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হত। কিন্তু এ নির্যাতনও তাদেরকে তাদের দ্বীন হতে ফিরাতে পারত না। আল্লাহ তাআলার কসম! আল্লাহ তাআলা অবশ্যই দ্বীনকে পরিপূর্ণ করবেন। ফলে একজন উষ্ট্রারোহী সান'আ হতে হাযারা মাউত পর্যন্ত একাই সফর করবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সে ভয় করবে না।[২]

উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া

উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন হলো মানুষকে সংশোধন করার অন্যতম একটি মাধ্যম। যা তার মধ্যে মানসিকভাবে প্রভাব সৃষ্টি করে। সে হিসেবে নেককাজ ও প্রতিদান লাভের ক্ষেত্রে তাকে উৎসাহ প্রদান করুন আর ভুল কাজের পরিণতি সম্পর্কে তাকে সতর্ক করুন। এ ব্যাপারে বেশ কিছু দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, পিতা-মাতার সদাচরণের ব্যাপারে উৎসাহ দেয়া। তাদের প্রতি অবাধ্যতার ব্যাপারে ভয় দেখানো।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, রবের সন্তুষ্টি পিতা-মাতর সন্তুষ্টির মাঝে। রবের অসন্তুষ্টি পিতা-মাতর অসন্তুষ্টির মাঝে।[৩]

হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পিতা হলো জান্নাতের সর্বোত্তম দরজা। তুমি ইচ্ছা করলে এটা ভেঙ্গে ফেলতে পার অথবা রক্ষণাবেক্ষণ করতে পার।[৪]

অনুরূপভাবে রাত্রি জাগরণের জন্য উৎসাহ দেয়া। আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় কোন ব্যক্তি স্বপ্ন দেখলে তা আল্লাহ তাআলার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে বর্ণনা করত। একবার আমার মনে আকাঙ্ক্ষা জাগলো যে, আমি কোন স্বপ্ন

[২] আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ৩৮৫২।
[৩] আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ১৮৯৯।
[৪] আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ১৯০০।

দেখলে তা আল্লাহ তাআলার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বর্ণনা করব। তখন আমি যুবক ছিলাম। আল্লাহ তাআলার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় আমি মসজিদে ঘুমাতাম। আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন দু'জন ফেরেশতা আমাকে ধরে জাহান্নামের দিকে নিয়ে চলেছেন। তা যেন কূপের পাড় বাঁধানোর ন্যায় পাড় বাঁধানো। তাতে দু'টি খুঁটি রয়েছে। এবং এর মধ্যে এমন কতক লোক আছে যাদেরকে আমি চিনতে পারলাম। তখন আমি বলতে লাগলাম, আমি জাহান্নাম হতে আল্লাহ তাআলার নিকট পানাহ চাই। তিনি বলেন, তখন অন্য একজন ফেরেশতা আমাদের সঙ্গে মিলিত হলেন। তিনি আমাকে বললেন, 'ভয় পেয়ো না'।

আমি এ স্বপ্ন আমা বোন হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট বর্ণনা করলাম। অতঃপর হাফসা তা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বর্ণনা করলেন। তখন তিনি বললেন, আব্দুল্লাহ কতই না ভালো লোক! যদি রাত জেগে সে নামায আদায় করত। তারপর হতে আবদুল্লাহ খুব অল্প সময় ঘুমাতেন।[৫]

ধীরে-ধীরে শিক্ষা দেয়া

উদাহরণ স্বরূপ, আপনার সন্তান আল্লাহ তাআলার ধ্যান-খেয়ালের মধ্য দিয়েই ছোট অবস্থায় নামায শিখবে। ধীরে ধীরে তার বয়সও বাড়তে থাকবে। সে আপনার নড়াচড়া অনুকরণ করবে। তারপর আপনি তাকে আপনার সাথে নামায পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন। সাথে সাথে তাকে নামাযের রোকন, শর্ত শিখাবেন। এরপর আসবে তার উপর নামায পড়ার বিধান। নামায পড়তে অবহেলা করলে তার উপর প্রহার করার শাস্তি প্রয়োগ করবেন। কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাত বছর হলে নামযের নির্দেশ দাও। আর দশ বছর হলে তাদেরকে প্রহার করো।[৬]

---

[৫] আস সুনান, ইমাম তিরমিযিঃ ৩৫৩০।
[৬] সুনানু আবি দাউদঃ ৪৯৫।

অনুরূপভাবে কুরআনের আয়াতের অর্থও শিক্ষা দিবেন। যেন সে হালাল-হারাম চিনতে পারে। তারপর যে আয়াতগুলোর অর্থ সে জেনেছে সে আয়াতগুলো মুখস্থ করে নিবে। যেন তার স্মৃতিপটে আয়াতগুলো বদ্ধমূল হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় এভাবে মুখস্থ করা তার পক্ষে অনেকটা সহজ হয়ে যাবে। সাথে সাথে তার শেখা বিষয়গুলোকে সমন্বয় করে দেয়ার চেষ্টা করবে।

হযরত জুনদুব ইবনু আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ছিলাম। আমরা ছিলাম তখন শক্তিশালী ও সক্ষম যুবক। আমরা কুরআন শেখার পূর্বে ঈমান শিখেছি। অতঃপর কুরআন শিখেছি। এবং এর দ্বারা আমাদের ঈমান বেড়ে যায়।[৭]

এভাবে নফল রোযা রাখার অভ্যাস করাবেন। ছোট থেকেই যেন তার প্রশিক্ষণ হয়ে যায়। তাহলে এটা রমজান মাসে পূর্ণ রোযা রাখার জন্য সহায়ক হবে।

মাসনূন দু'আগুলো শিখানো। সে দুগ্ধপোষ্য শিশু থাকা অবস্থায় মাসনূন দু'আসমূহ তার সামনে পুনরাবৃত্তি করা। এতে করে সে আপনার মুখ থেকে শুনে শুনেই দু'আগুলো শিখে ফেলবে। অতঃপর সন্তান যখন কথা বলা শুরু করবে তখন সেও আপনার সাথে দু'আগুলো পুনরাবৃত্তি করবে। যখন সে বড় হতে থাকবে, আপনিই তাকে পুনরাবৃত্তি করার জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন।

অনুসরণের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক রাতে আমার খালা মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট রাত্রি যাপন করলাম। রাতে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুম থেকে উঠলেন। এবং রাতের কিছু অংশ চলে যাবার পর আল্লাহ তাআলার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ঝুলন্ত মশক

[৭] আস সুনান, ইমাম ইবনু মাজাহ, হাদিস নং ৫২।

হতে হালকা ধরনের অযু করলেন। রাবী আমর বলেন যে, হালকাভাবে ধুলেন। অর্থাৎ পানি কম ব্যবহার করলেন। এবং নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। (ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন) তখন তিনি যেভাবে অযু করেছেন আমিও ঠিক সেভাবে অযু করলাম। অতঃপর এসে তার বাম পার্শ্বে নামাযে দাঁড়ালাম। তারপর আল্লাহ তাআলার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ধরে তার ডান পার্শ্বে দাঁড় করালেন। এরপর আল্লাহ তাআলার যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি নামায আদায় করলেন।[৮]

পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া

যেমন—আপনি তার কাছে একটি আবেদন কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করেন; যেন এর উপর সে অভ্যস্ত হয় এবং এর সাথে তার পরিচিতি লাভ হয়। উদাহরণসরূপ, প্রত্যেক আযানের সময় তাকে কয়েকবার নামাযের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাত বছর হলে নামযের নির্দেশ দাও। আর দশ বছর হলে তাদেরকে প্রহার করো।[৯]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি সন্তানদের ব্যাপারে পিতাদেরকে বলেছেন, তোমরা তোমাদের আদরের সন্তানকে কল্যাণকর বিষয়ে অভ্যস্ত কর। কেননা কল্যাণ অভ্যাস মোতাবেক হয়ে থাকে। লোকমুখে প্রচলিত আছে যে, 'অক্লান্ত পরিশ্রম বা একঘেঁয়েমি না করা ছাড়াই অবিচ্ছিন্ন পুনরাবৃত্তি উত্থিত হয়।'

ঘুমের পূর্বে শিক্ষনীয় গল্প শুনানো

এখানে আমি আবারও পূর্বের ঘটনাবলীর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। নবিদের জীবন কাহিনী থেকে শুরু করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন চরিত, সাহাবী ও নেককার লোকদের জীবনী

[৮] আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ৮৫৭।
[৯] সুনানে আবু দাউদ, হাদিস ৪৯৫।

শোনানো। নিজে নিজে পড়া-লেখা করার প্রতি সন্তানকে উৎসাহিত করা উচিত। যেন পড়া-লেখার সাথে তার সখ্যতা গড়ে উঠে।

ইবাদত করার নির্দেশ দেয়া

ইবাদতের নির্দেশ দেয়া শুরু করবে সাত বছর বয়সের কাছাকাছি হলে। আর এটাই হলো শিশুর নামায পড়া আবশ্যক হওয়ার বয়স। পিতা-মাতা সন্তানকে প্রতিটি আযানের সময় নামাযের ব্যাপারে সতর্ক করবে। সাথে সাথে ঐ সময়ে শিশুকে নামায সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেয়া আবশ্যক। নামাযের অর্থ কী? কীভাবে আমাদের উপর নামায ফরয হলো? নামায আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের প্রধান মাধ্যম। দুনিয়ার অশান্তি দূর করে অনাবিল শান্তি আনয়নের পাথেয় ইত্যাদি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিসের আলোকে তাকে শিক্ষা দেয়া। অনুরূপভাবে শিশুকে ঐ সমস্ত আয়াত শিক্ষা দেয়া যেগুলোর মধ্যে নামাযের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। ধৈর্যের সঙ্গে আদায় করার কথা বলা হয়েছে। অন্যায়-অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে নামায। ঈমান আর কুফরের মাঝে পর্থক্যকারী নামায ইত্যাদি। তাছাড়া নামায হলো মানুষের জীবনের মূল ভিত্তি; এগুলো তাকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেয়া। যেন সে নামাযের গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—তোমরা তোমাদের সন্তানকে সাত বছর হলে নামাযের নির্দেশ দাও। দশ বছর বয়স হলে প্রহার করো এবং তাদের শয্যা আলাদা করে দাও।[১০]

ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহু বলেন—পিতা-মাতার জন্য আবশ্যক হলো, তাদের সন্তানদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া এবং তাহারাত ও সালাত শিক্ষা দেয়া। বুদ্ধিসম্পন্ন হলে নামাযের জন্য প্রহার করা। সুতরাং যার স্বপ্নদোষ হলো কিংবা যে ঋতুবর্তী হলো অথবা পনের বছর পূর্ণ করলো,

[১০] সুনানে আবু দাউদ, হাদিস ৪৯৫।

তার উপর ফরয বিধান আবশ্যক হয়ে গেল।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহু বলেন—প্রত্যেক মান্যবর ব্যক্তির উপর আবশ্যক হলো যে তাকে মান্য করে তাকে নামাযের নির্দেশ দেয়া। এমনকি অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদেরকেও। তিনি আরো বলেন, যার নিকট কোনো স্বাধীন সন্তান আছে কিংবা ইয়াতিম অথবা নিজ সন্তান থাকে, অতঃপর তাকে নামাযের নির্দেশ না দেয় তাহলে ছোটকে নামাযের নির্দেশ না দেয়ার কারণে বড় ব্যক্তি শাস্তির উপযুক্ত হবে। এ কারণে তাকে তিরস্কার করা হবে। কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা অমান্য করেছে।

অনুরূপভাবে তাকে রোযাও শিক্ষা দেয়া। কেননা এই বয়সে সাধারণত শিশুরা রোযা রাখতে অভ্যস্ত হয়ে থাকে। তাকে বেশির থেকে বেশি অনবরত নফল রোযা রাখার প্রতি উৎসাহিত করা। কারণ এর দ্বারা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন হয়। সাথে সাথে রমজান মাসের রোযা রাখা তার জন্য সহজ হয়ে যাবে।

ইবনু মুনযির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, শিশু যখন ভালো কাজ করতে সক্ষম হয় তখন থেকেই তাকে নামাযের নির্দেশ দেয়া।

অসৎ লোকের সংশ্রব থেকে বিরত থাকা

শিশুরা এই বয়সে এসে বিদ্যালয়ের ভিতরে কিংবা বাহিরে সমবয়সীদের সাথে সম্পর্ক তৈরী করে। যেটা তাদের উপর ঘরোয়া পরিবেশের তুলনায় বেশি প্রভাব ফেলে। এ কারণে পিতা-মাতার উপর আবশ্যক হলো, সন্তানকে দিকনির্দেশনা দেয়া এবং ভালো বন্ধু নির্বাচন করতে সহযোগিতা করা। অসৎ বন্ধু থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করা। শিশুর ব্যক্তিত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এমন সৎ সঙ্গ নির্বাচনের প্রতি গুরুত্ব দেয়া। যেন সে আহলে ইলম ও নেককার লোকদের এড়িয়ে না চলে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মানুষ তার বন্ধুর ধর্ম অনুযায়ী চলে।[১১]

[১১] আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ২৩৭৪।

সুতরাং তোমাদের সকলেই যেন দেখে নেয় সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে!

অন্যত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হলো, আতরওয়ালা ও কামারের হাপরের ন্যায়। আতরওয়ালা হয়তো তোমাকে কিছু দান করবে কিংবা তার নিকট হতে তুমি কিছু খরিদ করবে অথবা তার নিকট হতে তুমি সুবাস পাবে। আর কামারের হাপর হয়তো তোমার কাপড় পুড়িয়ে দিবে কিংবা তার নিকট হতে পাবে দুর্গন্ধ।[১২]

এ কারণেই সালাফগণ তাদের সন্তানদের পিছনে থাকার ব্যাপারে বেশ গুরুত্ব দিতেন এবং সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহযোগিতা করতেন,

ইবরাহিম আল-হারবী রাহিমাহুল্লাহু বলেন—"তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে বিপদে নিপতিত হওয়ার পূর্বে অসৎ বন্ধু থেকে দূরে রাখ।'

এক ব্যক্তি বলেন, 'সন্তান সর্বপ্রথম নষ্ট হয় সঙ্গদোষে।'

আবু হাতেম রাহিমাহুল্লাহু বলেন—আমি আহমাদ ইবনু সিনানকে বলতে শুনেছি, যখন কোনো ব্যক্তি বেদআতী লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তখন আমি মনে করি তার পক্ষে যদি সম্ভব হয় তাহলে সে যেন তার ঘর বিক্রি করে দেয় এবং পরিবর্তন করে ফেলে। অন্যথায় তার সন্তান ও প্রতিবেশি ধ্বংস হবে।

মা'মার রাহিমাহুল্লাহু বলেন, আমি এক জলাশয়ের কাছে ইবনু তাউসের সঙ্গে ছিলাম। সালেহ নামক এক ব্যক্তি এসে তার সঙ্গে তাকদীর নিয়ে কথা বললো। তিনিও তার সঙ্গে কথা বলতেছিলেন। একপর্যায়ে তাউস তার আঙ্গুল কানের ভিতরে ঢুকিয়ে তার ছেলেকে বললো, তুমিও ভালোভাবে তোমার কানে আঙ্গুল দিয়ে রাখ। যেন তার কোনো কথা তুমি শুনতে না পারো। কেননা মানুষের অন্তর বড়ই দুর্বল।

[১২] আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ৫৫৩৪।

নেককার আহলে ইলমের সাহচর্য গ্রহণ করা

শিশুকে যেমনিভাবে অসৎ বন্ধু থেকে দূরে রাখা গুরুত্বপূর্ণ; তেমিভাবে নেককার আহলে ইলমের সাহচর্যে নিয়ে যাওয়াও গুরুত্বপূর্ণ। যেন তারা তাদের অনুসারী ও অনুকরণকারী হতে পারে। বিশেষকরে আমাদের এই যুগে, যে সময়ে চতুর্মুখী ফেতনা আমাদেরকে গ্রাস করে নিচ্ছে।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিকির ও যিকিরকারীদের মজলিসের ফযলিত সম্পর্কে বলেছেন, তারা এমন লোক যাদের সহচররা কখনো হতভাগা হয় না। অর্থাৎ তাদের মজলিসে যে বসে সে আল্লাহ তাআলার রহমত ও মাগফেরাত লাভ করে।[১৩]

লোকমান হাকিম স্বীয় ছেলেকে লক্ষ্য করে বললেন—'বেটা! উলামাগণের মজলিসে হাঁটু গেড়ে বসো। কেননা আল্লাহ তাআলা হেকমতের নূর দ্বারা বান্দার অন্তর পুনরুজ্জীবিত করেন। যেমনিভাবে আকাশের বৃষ্টি দ্বারা যমিনকে উর্বর করেন।'

মসজিদ ও শরয়ি বৈঠকেও সন্তানকে নিয়ে যাওয়া মুস্তাহাব। কেননা এ দুটোই উত্তম জায়গা। এখান থেকেই চেনা যায় আহলে ইলম ও নেককার লোকদেরকে।

সুরক্ষা থাকার দু'আ শিখানো

শাইতান ও যাবতীয় ক্ষতিকর বস্তু থেকে শিশুর সুরক্ষার জন্য মাসনূন দু'আর বিরাট ভূমিকা রয়েছে। সে এখন যে বয়সে পৌঁছেছে এ সময়ে মাসনূন দু'আর গুরুত্ব নিজেই উপলব্ধি করবে। এবং সে নিজে নিজেই তা পুনরাবৃত্তি করতে সক্ষম হবে।

আমর ইবনু শুয়াইব তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, রাসুলুল্লাহ

---

[১৩] আস সহিহ, ইমাম মুসলিম: ২৬৮৯।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ভীতিকর পরিস্থিতিতে এ বাক্যগুলোর মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করা শিক্ষা দিতেন।

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ. مِنْ غَضَبِهِ، وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَنْ يَحْضُرُونِ

'বিসমিল্লাহি আয়ুযুবি কালিমাতিল্লাহিত-তাম্মতি মিন গযাবিহি ওয়া ইকাবিহি ওয়া শাররি ইবাদিহি ওয়া মিন হামাযাতিশ শাইয়াতিনা ওআই ইয়াহদুরুন।'

> অর্থাৎ-আল্লাহ তাআলার পূর্ণ কালিমা সমূহ দ্বারা তাঁর আযাব, গযব, তার বান্দাদের খারাবী ও শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং আমাদের নিকট তার উপস্থিতি হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ বাক্যগুলো তার বালেগ সন্তানদের ঘুমের সময় শিখাতেন আর নাবালেগদের গলায় ঝুলিয়ে দিতেন।[১৪]

[১৪] ইবনু আবিদ দুনিয়া রচিত আল ইয়াল, ২/৮৬১।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শিশুমনে ঈমানের বীজ বপনকারী কিছু বই

শিশুমনে ঈমানের বীজ বপনকারী কিছু বই

আলহামদুলিল্লাহ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আমরা শেষ ধাপে এসে পৌঁছেছি। এ যাবত পূর্বে যা আলোচনা হয়েছে; এগুলো একটি গাইডলাইন (নির্দেশিকা) ছিল মাত্র। এখন এই নির্দেশনা অনুসরণ করার জন্য নির্বাচিত কিছু গ্রন্থের দিকনির্দেশনা বাকী রয়ে গেছে। আমি স্বয়ং এই নির্দেশনাসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা পাঠ্যক্রম লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সময়ের অভাবে আমি সিদ্ধান্তটি স্থগিত করার ইচ্ছা করেছি। আমি আপনাকে বাজারে পাওয়া যায় এমন কিছু বইয়ের পরামর্শ দিচ্ছি। তবে সবগুলো আপনার সন্তানের জন্য উপযোগী নয়। অতএব এটার উপর নির্ভর করার আগে এই বইগুলো সম্পর্কে পূর্ণ অবগত হওয়া উচিত।

এখানে আমি কিছু বইয়ের নাম সাজেস্ট করছি যা আপনি সহজেই পেয়ে যাবেন। এর মধ্য থেকে কিছু কিছু বইয়ের ব্যাখ্যা করেছেন কয়েকজন স্কলার। সর্বশেষ আমি সতর্ক করে দিতে চাই যে, বেশ কিছু বইয়ে শরয়ি ভুল রয়েছে। যেমন—শিশুকে দরূদ সালামের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য ঈদ-মিলাদুন্নবী উদযাপনের প্রতি উৎসাহিত করা ইত্যাদি। এই জন্য ঐসব বই পরহেয করে চলা উত্তম।

আকীদা ও তাওহিদ

১.তালিমুস সিবইয়ান আত্ব-তাওহিতদ। লেখক -শাইখ মুহাম্মদ ইবনুল ওয়াহহাব।

২.আকীদাদাতুত্ব তিফলিল মুসলিম। লেখক-ড. ইবরাহিম শারবিনী।

৩.আল-আকীদাহ লিত-তিফলিল মুসলিম।

৪.আত-তাওহিদ লিন-নাশিয়া ওয়াল মুবতাদিয়ীন। লেখক—ড. আবদুল আজীজ।

৫. আছয়িলাহ ও আজভিবাহ লিস-সিগার। লেখক- সালেম ইবনু সা'দ।

৬. সিলসিলাতু হাযা খালকিল্লাহ।

৭. আল্লাহু আ'ত্বনী। লেখক- হুদাইল আল-আব্বাসী।

৮. আল্লাহু ইয়ুহিব্বুনী। লেখক- হুদাইল আল-আব্বাসী।

৯. সিলসিলাতুল বারায়িমিল মু'মিনাহ।

১০. ওয়াসফুল জান্নাহ লিল-মুসলিমিস-সগীর। লেখক- আদলী আবদুর রউফ আল গাযালী।

১১. কুদরতুল্লাহ ফি খালকিল ইনসান। লেখক- হিসাম আল-আকাদ।

১২. আছয়িলাহ ও আজভিবাহ ফিত-তাওহিদ।

১৩. আসমাউল্লাহিল হুসনা লিল-আতফাল। লেখক-হামেদ আহমাদ তাহের।

১৪. সিলসিলাতু আসমাউল্লাহিল হুসনা। লেখক- মুহাম্মদ সাফীর।

১৫. সিলসিলাতু আরকিনিল ঈমান।

১৬. সিলসিলাতু মালায়িকাতির-রাহমান। লেখক- আবদুল মুনয়িম আল-হাশেমী।

নবিদের ঘটনাবলী ও সীরাতে রাসুল সা.

১.কসাসুস-সিরাহ। লেখক- আবদুল হামীদ জাওদাহ।

২. কসাসুল আম্বীয়া। লেখক- আবদুল হামীদ জাওদাহ।

৩. কসাসুন্নাবাবিয়্যাহ। আবদুল হামীদ তাওফিক।

৪. আস-সিরাতুন্নাবাবিয়্যাহ লিল-আতফাল। লেখক- মুহাম্মাদ ত্বহের নবি।

৫. হায়াতু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফী-ঈশরীনা কিসসাহ। লেখক- আবদুত-তাওয়াব ইউসুফ।

৬. সিলসিলাতু আম্বিয়া-য়িল্লাহ। লেখক-সামীর হলবী।

৭. হায়াতুল আম্বিয়া লিল-আতফাল। লেখক-হামেদ আহমাদ তাহের।

৮. মাযা তা'রিফু আনিল-আম্বিয়া, লেখক-সাফীর।

৯. মিন কাসাসিল কুরআন। লেখক-আবদুর রউফ আবদুস সালাম।

১০. মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। লেখক-আহমাদ আন-নাজী।

পুরুষ ও নারী সাহাবীদের জীবন চরিত

১. সুয়ারুমমিন হায়াতিস সাহাবাঃ ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা।

২. সুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবিয়্যাতঃ ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা।

৩. সুয়ারুম মিন হায়াতিত তাবিয়ীনঃ ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা।

৪. কিসাসুল খুলাফায়ির-রাশেদীনঃ আবদুল হামীদ জাওদাহ।

৫. সিলসিলাতু আ'মিদাতিল ইসলামঃ হালমী আলী শা'বান।

৬. রিজালু হাওলির রাসুল লিল-আতফালঃ মুহাম্মদ সায়েম।

৭. যাওজাতুস সাহাবাঃ আবদুল আজীজ শানাবী।

৮. কাসাসুস সাহাবিয়্যাতঃ ড. মুস্তফা মুরাদ।

ফিকহ শাস্ত্র

১. আল-ফাকিহুস সগীর। লেখক-ড. ইবরাহিম শারবিনী।

২. আস-সলাত লিত-তিফলিল মুসলিম।

৩. বুস্তানুল মুসলিমিস-সগীর। লেখক-রমজান আবদুল হাদী।

৪. আসসলাত লিল-মুসলিমিস-সগীর। লেখক- আদলী আবদুর রউফ।

হাদিস শাস্ত্র

১.আল-আরবায়ীন আন-নাবাবিয়্যাহ। লেখক ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহু।

২. সিলসিলাতুল আহাদীসিল কুদসিয়্যাহ। লেখক-সফীর।

কুরআনের ঘটনা ও তাফসির

১.কাসাসুল কুরআন লিল-আতফাল। লেখক-মুহাম্মদ সায়েম।

২. সিলসিলাতুত-তাফসিল লিস-সিগার।

৩. আত-তাফসিরুল মুয়াচ্ছার লিস-সিগার। লেখক-আহমাদ আবদুল ফাত্তাহ তামাম।

শিষ্টাচার, চরিত্র ও মাসনূন দু'আ

১.হিসনুল মুসলিম লিস-সিগার। লেখক- শায়েখ ইয়াসিন।

২. আল-আখলাক ফিল-মুসলিম। লেখক- মুহাম্মদ মাতারজী।

৩. সিলসিলাতু আখলাকিল মুসলিমিস-সগীর। লেখক-মুহাম্মদ সফীর।

৪. হিসনুত-তিফলিল মুসলিম।

৫. সিলসিলাতু আদইয়াতিল মুসলিমিস-সগীর। লেখক-সফীর।

পরিশিষ্ট

সন্তান জীবনের শ্রেষ্ট সম্পদ

মূলত মানুষের জীবনে অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও অন্যান্য যত দিক আছে এর মধ্য সবচেয়ে বেশি মূল্যবান আপন সন্তান। সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ হলো আমার সন্তান। সে শুধু আমার ভালবাসাই নয় বরং আমার আখেরাতের পাথেয়ও। পরকালীন জীবনের পূঁজি। আমার সন্তান দুনিয়া ও আখেরাতে আমার সফলতার অংশীদার। মৃত্যুর পরও আমার কবর ঘর আমার নেক সন্তানের পাঠানো হাদিয়াতে সিঞ্চিত হবে।

পশুও নিজ সন্তানকে ভালবাসে

বিবেক বুদ্ধিহীন পশুও তার সন্তানকে ভালবাসে। বিস্ময়কর বিষয় হলো পশু কখনো কখনো তার সন্তানকে মানুষ থেকেও বেশি ভালবাসে। নিজ সন্তানকে সে নিজ লালান-পালনেই বড় করে তোলে। আরো বিস্ময়কার হচ্ছে, আজ মানুষ তার সন্তানকে লালন-পালন ও গড়ে তোলার সময় পায় না। সন্তানকে তার শ্রেষ্ট সম্পদ মনে করে না। আখেরাতের পূঁজি মনে করে না। সন্তান কিভাবে বেড়ে উঠছে এ বিষয়ে মানুষ আজ সম্পূর্ণ উদাসীন। সন্তান নিয়ে তার কোন পরিকল্পনাই নেই। নেই কোন ভাবনা। মানুষ আজ পশুর চেয়েও বেশি সংজ্ঞাহীন নিজ সন্তানের লালন পালনের ব্যাপারে।

সন্তানকে কারা লালন পালন করছে?

ছোট ছেলে মেয়েকে চাকর-বাকররা লালন-পালন করে। আর স্বামী-স্ত্রী সকাল সন্ধ্যা টাকা অর্জনের জন্য চাকুরীতে সময় ব্যায় করছে। সন্তানকে নিজের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত রাখছে। এটাকে এই যুগে উন্নত জীবনাচার মনে করা হচ্ছে। মা-বাবা তো অর্থ উপার্জনে একে অপর থেকে পৃথক থাকছেই সাথে সাথে সন্তানকেও পৃথক রাখছে। সন্তানকে লালন পালনের দায়িত্ব দিয়ে রাখছে চাকর-বাকরের হাতে। গোটা ইউরোপে আজ এমন দৃশ্যই চোখে পড়ে। বড় দুঃখের বিষয় হলো আজকের মুসলিম জাতিও

ইউরোপদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ করছে। যাদের অনুসরণীয় কোন ব্যক্তি নেই। নেই কোন উত্তম আদর্শ। অথচ মুসলমানদের এমন এক ব্যক্তি আছেন যার প্রতিটি পদক্ষেপে রয়েছে মুসলমানদের জন্য কল্যাণের স্রোতধারা। যা আল্লাহ প্রদত্ত শাশ্বত বিধান।

নৈতিক শিক্ষা আবশ্যকীয়

আজ কাফেরদের স্বভাবগুলো মুসলমানদের মাঝেও ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলেছে। সন্তান তার পরিবারের বড়দের সংস্পর্শ ও পরিচর্যা পাচ্ছে না। ফলে তারা উন্নত স্বভাব, বংশীয় আভিজাত্য, পারিবারিক ঐতিহ্য, চরিত্র গঠন, ধর্মীয় অনুশাসন এবং পারিবারিক নৈতিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কিন্তু একটি শিশুর নৈতিক শিক্ষার জন্য এই সময়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চাকর-বাকর দিয়ে লালন পালনের কারণে বংশীয় আভিজাত্য পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

'মা' হল শিশুর প্রথম শিক্ষক

'মা' হলো সন্তানের প্রথম শিক্ষক। সর্বোৎকৃষ্ট বিদ্যানিকেতন। প্রথম সংশোধিত হবার স্থল। কিন্তু এ যুগে নতুন একটি পীড়াদায়ক বিষয় আবিস্কৃত হয়েছে। যার ফলে সন্তানের শিক্ষার জন্য বাবা-মা'র কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় না। সন্তানের শিক্ষার শুরুই হয় বেতনভুক্ত শিক্ষকের দ্বারা। এমনকি সন্তানের শিক্ষা দেয়া হয় নেট ইন্টারনেট ছেড়ে দিয়ে। এ জন্যই নেপোলিয়ন বড় চমৎকার বলেছেন— 'তোমরা আমাকে একজন আদর্শ 'মা' দাও তাহলে আমি তোমাদেরকে একটি আদর্শ জাতি দিব'।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদের সাথে খেলা করতেন

নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের নাজাত ও মুক্তির জন্য

গভীর চিন্তায় সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন। এরপরও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট রাসুল শিশুদের সাথে এমনভাবে খেলাধুলা ও সময় কাটাতেন যে, এ যুগে সন্তানদের সাথে সেভাবে খেলাধুলাকে অনর্থক বিষয় মনে করা হবে। এমনকি নিরর্থক বিষয়ও ভাবা হবে। এ জন্য আদর্শ পিতা হতে হলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ সব সুন্নতগুলোকেও নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে। হাদিসের মধ্যে এসেছে- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসান-হুসাইনের সাথেও খেলাধুলা করতেন।

নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি তাঁর প্রিয় নাতি হাসানাইন (হাসান ও হোসাইন) এর জন্য উট বনে যেতেন। তিনি কনুই ও হাটু মাটিতে লাগিয়ে পিঠে নাতিদেরকে তুলে চক্কর লাগাতেন। একজন উটের মতো 'ডানে চল, বাম চল' লাগাম লাগাতো, অপরজন পেছন থেকে হাঁকাতো। এভাবে হাসান হুসাইনকে নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলতেন। লোকজন দেখে বলতো এটি কেমন সওয়ারী? তারা উত্তর দিত দুনিয়ার সবচেয়ে দামী সওয়ারী।

নবিজি শিশুদের প্রানভরে সোহাগ করতেন

নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তানদের সাথে খুবই গভীরভাবে মিশতেন। সাহাবাদের সন্তানদের সাথে আনন্দ ফুর্তি করতেন। তাদের সাথে ছোট শিশুতোষ আচরণ করে মিশে যেতেন। তাদেরকে প্রানভরে সোহাগ করতেন। তাদেরকে সুন্দর সুন্দর উত্তম কথা শিক্ষা দিতেন। তাদের মাঝেও দাওয়াত ও জিহাদের প্রেরণা যোগাতেন। ঐ সময় এভাবেই মদিনার প্রতিটি সন্তান তাদের বড়দের সংস্পর্শে বেড়ে উঠতো।

মসজিদে নববীতে শিশুরা খেলা করত

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে খুতবা দিচ্ছেন। এমন সময় হাসান হোসাইন নবিজির চাদর টানতেন। নামাযের জামাতে

সিজদায় গেলে তারা কাঁধে চরে বসতেন। তারা নামার পর আবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেজদা দিতেন। কিন্তু কখনো ধমক দিতেন না। আজ তো আমরা সন্তানদেরকে মসজিদ থেকে তাড়িয়ে দেই। পেছনে ঠেলে দেই। ভয় দেখিয়ে ভাগিয়ে দেই। এ কেমন চরিত্র! আজ রাসুলের উম্মতের উচিত সন্তানদেরকে মসজিদে যাওয়ার প্রতি উৎসাহিত করা। নতুবা পরবর্তী প্রজন্ম মসজিদ বিমূখ হয়ে যাবে।

সন্তান যেন ভুলে না যায়

যখন মানুষের জীবনে দ্বীন থাকে না তখন নিখাদ সম্পর্কও ধ্বংস হয়ে যায়। দুনিয়াবাসী আজ এতটা উদাসীন হয়ে বসেছে যে, বাবা-মায়ের নিকট সন্তানের কোন খোঁজ-খবর নেই। সন্তানের নিকটও বাবা-মায়ের কোন খোঁজ-খবর নেই। যেমন—পশু তার সন্তানকে বড় হলে ভুলে যায়, তেমনি আজ মানুষ বয়স হবার পর বাবা-মা'কে ভুলে যায়। শৈশবে মা-বাবা সন্তানকে স্নেহ মায়ায় বড় করছে না, সন্তানও বড় হয়ে বাবা-মা'র খেদমত করছে না। বোঝা মনে করে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসছে।

সুন্নাতই হল জীবনাদর্শ

শ্রেষ্ঠ জীবন গঠনে আমাদের জন্য নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতই একমাত্র উত্তম আদর্শ। দ্বীন, ইসলাম ও শরীয়তের সারমর্ম হলো 'ইত্তেবায়ে সুন্নাত' অর্থাৎ সুন্নাতের অনুসরণ ও অনুকরণ। সুন্নাতের পুর্ণাঙ্গ অনুসরণ ছাড়া কখনো দ্বীন পরিপূর্ণ হতে পারে না। জীবনও কখনো সুখময় হতে পারে না। সন্তান লালন পালনে রাসুলের উত্তম আদর্শ সামনে না রাখলে সন্তানও তখন নিজ দ্বীনের উপর থাকতে পারে না।

একটি জাতি তখনই নিজের ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলে, যখন উক্ত জাতির লোকেরা তাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলোকে ভুলে যায়। ভুলে যায় তাদের শ্রেষ্ঠ মানুষদের ইতি কথা। আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত রূপে প্রেরণ করেছেন।

আফসোস! বর্তমান প্রজন্ম সেই শ্রেষ্ঠ মানুষটি সম্পর্কেই জানে না।

এটি মুসলিম উম্মাহর জন্য বড়ই দূর্ভাগ্যের কারণ। কেন আমাদের সন্তানেরা ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এর কিছু কারণ নিম্নে উল্লেখ করছি—

১. আমাদের সন্তানেরা জানে না যে, নবিজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে? পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটি সম্পর্কে তারা অনবিজ্ঞ। তারা জানে না রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন শ্রেষ্ঠ পিতা। শ্রেষ্ঠ স্বামী। শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী। শ্রেষ্ঠ দরদী। শ্রেষ্ঠ বিচারক। শ্রেষ্ঠ দানশীল। শ্রেষ্ঠ সংগঠক। শ্রেষ্ঠ সমর নায়ক। শ্রেষ্ঠ ইবাদতকারী এবং আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি।

২. বাংলাদেশের অধিকাংশ ছেলে-মেয়েরাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিস্তারিত জীবনী জানে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গী-সাথী অর্থাৎ সাহাবাদের জীবনী জানে না। ইসলামের সঠিক ইতিহাস জানে না। এমনকি তাদের মা-বাবারাও জানেন না। অথচ যার মাধ্যমে এই পৃথিবীতে ইসলাম এসেছে এবং ইসলাম বাস্তবায়িত হয়েছে তার জীবনী জানা আমাদের জন্য কতটা আবশ্যকীয় ছিল।

৩. আমাদের দেশীয় সিলেবাসে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনী যতটুকু পড়ানো হয়; ততটুকুতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চেনার মত চেনা মোটেও সম্ভব নয়।

৪। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষক না থাকা, থাকলেও ধর্ম সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান না থাকা বা 'ইসলাম শিক্ষা' বইকে ততটা মূল্যায়ন না করা।

৫। আমাদের দেশে রবীন্দ্র, নজরুল, লালন, জসিম উদ্দিন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, আব্বাস উদ্দিন, জয়নুল আবেদীন, শামসুর রহমান, হুমায়ুন আহমেদ প্রমুখ বিভিন্ন প্রতিভাবানদের নিয়ে নানা রকম

সেমিনার, কনফারেন্স, সপ্তাহব্যাপী আলাচনা অনুষ্ঠান ইত্যাদি দেশের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিগুলাতে, বিশ্বসাহিত্য, টিএসসিতে বছরের বিভিন্ন সময়ে উত্থাপিত হয়ে থাকে। এসব অনুষ্ঠানগুলাতে বুদ্ধিজীবী, কলেজ ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, কবি-সাহিত্যিক, লেখক-লেখিকা, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার প্রমুখগণ বিভিন্ন পেশার লোকেরা খুবই আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় হচ্ছে এই ধরণের অনুষ্ঠানগুলোর আয়াজকেরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নিয়ে কোন সেমিনার বা কনফারেন্সের আয়োজন করেন না। তাই ঐ শ্রেণীর নাগরিকগণ রাসুল মুহাম্মাদ সম্পর্কে তেমন কিছু একটা জানতে পারে না।

উলামাগণ শীতকালে যে ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করেন, তাতে ঐ শ্রেণীর নাগরিকগণ অংশগ্রহণও করেন না। আর ঐ ওয়াজ মাহফিলের পরিবেশও তাদের জন্য অনেকাংশে মানানসই নয়।

৬. বাংলাদেশে নজরুল একাডেমী, বাংলা একাডেমী, ভাষা ইনস্টিটিউট, রবীন্দ্র কুঠি বাড়ি মিউজিয়াম ইত্যাদি নামে বিভিন্ন গবেষণা পরিষদ এবং গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে। অনেকে কাজি নজরুল ইসলাম, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর পি.এইচ.ডি করেন। কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নিয়ে কোন গবেষণার সুযোগ নেই। ইনস্টিটিউটও নেই। টি.এস.সি-তে সপ্তাহব্যাপী কবিতা উৎসবের ন্যায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনী নিয়ে কোন আয়োজন হয় না। যার কারণে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটি সম্পর্কে এ যুগের আধুনিক ছেলেমেয়েরা অজ্ঞই থেকে যাচ্ছে।

শিশুদের নিয়ে খেলা করা সুন্নত

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল নিজ পরিবারের ও সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শিশুদের নিয়ে খেলা করা। নিজ ঘরের

শিশুদের সাথে খেলা না করা এটি অহংকারের আলামত। বর্তমান সমাজে অন্য শিশুদের সাথে মেশাকেও নিজ যোগ্যতার পরিপন্থি কাজ বলে মনে করা হচ্ছে। মনে করা হচ্ছে আমার মতো মর্যাদাবান লোকের দ্বারা এমন শিশুসুলভ কাজ করা অনুচিত বা অসম্মানের। আমাদের জন্য এটা খুবই পরিতাপের বিষয়। নবিজির চেয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন ও সম্মানিত মানুষ দুনিয়াতে কে আছে? তিনি সন্তানদের নিয়ে সময় কাটিয়েছেন। খেলাধুলোও করেছেন।

অনেক লোক আছেন, যারা সন্তানদেরকে কোলে নেন না। এমনকি নিজের ছেলেকেও না। তারা এটাকে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখেন। এ সবই হচ্ছে সুন্নাহ পরিপন্থী কাজ। এগুলো পরিহার করা আবশ্যক। খেলাধুলার সময়ও মা-বাবার উচিত শিশুকে সঙ্গ দেয়া। তাহলে সে ভাববে শাসনের সময়ও আমার আব্বু-আম্মু আমার পাশে, খেলাধুলার সময়ও আমার পাশে। সে আপনার কথা খুব সহজেই মানতে সদা প্রস্তুত থাকবে।

শিশুদের প্রতি দয়াশীলতা প্রদর্শন করা

আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বনর্ণা করেন, আমি রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর থেকে আপন পরিবার পরিজন ও ছোটদের প্রতি বেশি দয়াশীল আর কাউকে দেখিনি।' তুমি শিশুর প্রতি তার শৈশবে দয়াশীল না হলে সে বড় হয়েও তোমার প্রতি দয়াশীল হবে না। বড় হলে তার সামনে কোন আদর্শ থাকবে না। এ জন্য বর্তমানে দেখা যায়, মা-বাবা বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছে, অথচ সন্তান তাদের প্রতি উদাসীন। এর একটা কারণ এটাও হতে পারে যে, ছোট সময়ে তারা সন্তানের প্রতি স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসার ব্যবহার করেনি। যার ফলে সন্তান এখন তাদেরকে এড়িয়ে চলছে।

ছোটদের বিরহে কান্না করা

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ছেলে ইবরাহিম রাদিয়াল্লাহু

আনহু এর ঘরে যেতেন। তার ঘরটি মদিনার এমন জায়গায় অবস্থিত, যেটা অধিকাংশ সময় ধোয়াচ্ছন্ন হয়ে থাকতো। সেখানে লোহা গলানোর জন্য লোহাকে আগুনে জ্বালানো হত। জায়গাটি কামারের কাজের স্থান। তিনি ধোঁয়ার ভিতর দিয়েই সেখানে গিয়ে ইবরাহিম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কোলে তুলে নিয়ে চুমু খেতেন। যখন তার ইন্তাকাল হয়ে গেল, তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক কষ্ট পেলেন। তিনি বলতেন, ইবরাহিম জান্নাতের ফুল বাগিচায় খেলা করছে। তাঁর দুধ পানের সময় শেষ হওয়ার আগে মৃত্যু হয়েছে। আল্লাহ তাকে জান্নাতে দুধ পান করানোর জন্য খাদেম দিয়েছেন। তার বিরহে নবিজি নিজ চোখের পানি ফেলতেন।

ছোটদেরকে বুকে জড়িয়ে নেয়া

আব্দুল্লাহ ইবনু হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ, উবায়দুল্লাহ, আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর দুই ছেলে এবং কাসিরকে একত্রে সমান করে দাঁড় করিয়ে তিনি গিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা একসাথে দৌড় দাও। দেখি কে আমাকে আগে এসে ছু'তে পার! যে আগে আমার কাছে এসে পৌঁছবে তাকে আমি বড় পুরস্কার দিব। তারপর তিনজন কাছে এলে তিনজনকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন। বুকের সাথে লাগালেন। এতে তারা খুব খুশি হলো।

শিশুদের আবদার পূরণ করা

আব্দুল্লাহ ইবনু জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—যখন রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সফর থেকে মদিনায় ফিরতেন, তখন পরিবারের সন্তানরা নবিজির কাছে দৌড়ে আসতো। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন এক সফর থেকে আসলেন। তখন হাসান হুসাইন সংবাদ পেয়ে দৌড়ে রাস্তায় গেলেন। তাঁরা রাসুলের সাথে সওয়ারিতে উঠার আবদার করলো। রাসুল উভয়কে নিজের সওয়ারিতে উঠালেন। তারপর আবদুল্লাহ, উবায়দুল্লাহ ও বনি আব্বাসের সন্তানরা

সওয়ারিতে উঠার জন্য দৌঁড়ে এলো। তিনি সবাইকে সওয়ারিতে উঠিয়ে আদর করলেন।

শিশুদের সাথে রসিকতা করা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশুদের সাথে রসিকতা করতেন। রসিকতা করাও সুন্নত। এ ব্যাপারে একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, আনাস ইবনু মালেক রাহিমাহুল্লাহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সাথে রসিকতা করতেন। এমনকি তিনি আমার ছোট ভাইকে মজার ছলে বললেন, ওহে আবু উমায়ের! কি করলো তোমার নুগায়ের?

এ হাদিস থেকে বুঝা যায় যে, রসিকতা করাও রাসূলের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আজকাল দেখা যায় আমাদের সমাজে অনেক লোক আছে তারা বলে—সন্তান এসব আমার পছন্দ না। অথচ সে চিন্তা করে না যে, একদিন সে নিজেও সন্তান ছিল। সন্তানদের সাথে রসিকতা করলে তারা আনন্দ পায়। বড়দের সাথে সহজেই মিশতে পারে। নিজেদের মনের কথা সব খুলে বলতে পারে।

সন্তানকে চুমু খাওয়া

সন্তানকে যদি চুমু দেন তাহলে তার অন্তরে আপনার প্রতি এক অকৃত্রিম ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোলে হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু খেলাধুলা করছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে চুমু দিলেন। সেখানে আকরা' ইবনু হাবেস রাদিয়াল্লাহু আনহু বসা ছিলেন। তিনি সহসা বলে উঠলেন, হে আল্লাহর নবি! আমার দশজন সন্তান রয়েছে। আমি আজও কাউকে চুমু দেইনি। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'যে ছোটদের প্রতি দয়া করবে না, তার প্রতিও দয়া করা হবে না।'

এ জন্য আমাদের উচিত সন্তানদের মাথায় হাত বুলানো। বুকে টানা।

কপালে চুমু খাওয়া। এতে সে বুঝতে পারবে যে, আমার মাথার উপর কারো না কারো ছায়া রয়েছে।

সন্তানদেরকে হাসি মুখে স্বাগত জানানো

আমরা অনেক সময় গোমড়া মুখ নিয়ে সন্তানদের সামনে আসি। সন্তান যখন মাদরাসা বা অন্য কোথা থেকে আসে তখন আমরা আমাদের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকি। তাকে সময় দেই না। আমাদের জন্য উচিত হল, কমপক্ষে এক মিনিট বা আধা মিনিট সময় বের করে তাকে সময় দেয়া। তাকে 'আহলান সাহলান' বলা। তাহলে এর দ্বারা সন্তানের এটা অনুভূত হবে যে, আমার পিছনে এমন কেউ আছেন, যিনি সর্বদা আমার প্রতি লক্ষ্য রাখছেন। সন্তানের অন্তরে সুন্দর এক অনুভূতি তৈরি হবে। সন্তানকে যদি এতটুকু মুহাব্বত না দেয়া যায় তাহলে তার ভেতরটা অনুভূতি শূন্য থেকে যাবে। অনেক এমন পরিবার আছে, যাদের সন্তানরা চুপচাপ থাকে। গোমড়া মুখ নিয়ে থাকে। যে কাউকে দেখেই আতঙ্কবোধ করে। কারো সাথে কথা-বার্তা বলে না। এসব লক্ষণ দ্বারা অনুমান করা যায় যে, সন্তানকে যথাযথভাবে পরিচর্যা করা হয়নি। এ জন্য মা-বাবার উচিত সন্তানকে দেখে আনন্দ প্রকাশ করা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে যখন কোন শিশু নিয়ে আসা হত তখন তিনি কখনো তার কপালে চুমু দিতেন। কখনো মুখের উপর চুমু দিতেন। এরপর কোলে নিয়ে বসাতেন। হাসি মুখে রসিকতা করতেন। তাকে প্রফুল্ল বা আনন্দিত করতেন। তার কপালে স্নেহ মাখা হাত বুলাতেন। এভাবে পিতা-মাতার উচিত হলো, যখনই সন্তান সামনে আসবে তখন তার সাথে উত্তম ব্যবহার করা। তার সাথে মুচকি হেসে কথা বলা। এটাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাত।

শিশুকে গোপনীয়তা শিখানো

অনেক সময় সন্তান একজনের একান্ত কথা অন্যজনের কাছে কিংবা কারো থেকে শোনা কথা অন্যের কাছে বলে বেড়ায়। এটা খুবই মন্দ স্বভাব।

এর দ্বারা অন্তরে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এ জন্য নিজ ছোট ছেলে মেয়েকে বুঝানো যে, যদি কোন কথা শোনো, তাহলে চুপ করে থাকো। যা শুনছো কারো কাছে বলবে না। অন্যথায় মায়ের কথা বাবার কাছে, বাবার কথা মায়ের কাছে বলবে। এরপর যখন উভয়ের মাঝে ঝগড়া হবে তখন সে খুব আরামের সহিত বসে শুনতে থাকবে।

শিশুদের জন্য উপযোগী খেলাধুলার ব্যবস্থা করা

বর্তমান সময়ে দেখা যায়, পিতা-মাতা বিনোদনের জন্য সন্তানদের সামনে মোবাইল ও কম্পিউটারে গেমস চালু করে দেয়। এর দ্বারা সন্তানের মানসিক বিনোদন হলেও শারীরিক কোন বিনোদন হয় না। অতএব সন্তানদের জন্য এমন খেলাধুলার ব্যবস্থা করা, যেন সন্তানের মন-মস্তিষ্ক ও শরীর উভয়টারই বিনোদন হয়।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বিয়ের পরও পুতুল দিয়ে খেলা করতেন। তা অবশ্য চোখবিহীন পুতুল ছিল। এর কোন আকৃতি ছিল না। ঐ সময় আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর বয়স মাত্র নয় বছর ছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে খেলা করতে দেখে খুব খুশি হতেন। এ জন্য শরয়ি সীমারেখার মধ্যে থেকে সন্তানদের জন্য খেলাধুলার সরঞ্জমাদীর ব্যবস্থা করে দেয়া।

অনেক সময় দেখা যায়, সন্তান এমন একটা জিনিস পছন্দ করে, মা-বাবা সেটা পছন্দ করেন না। জিনিসটি খেলাধুলা, আনন্দ-বিনোদন ও খাওয়া-দাওয়া বিষয়কও হতে পারে। তাহলে এ ক্ষেত্রে বুদ্বিমত্তার পরিচয় হলো, সন্তান যেটাকে পছন্দ করে; সেটা যদি অসৎ কোন কিছু না হয়, তাহলে তাকে ঐ জিনিসের ব্যবস্থা করে দেয়া। এর দ্বারা সন্তানের ভিতরে পিতা-মাতার প্রতি ভালোবাসার শিকড় সুদৃঢ় হবে। আস্থার জায়গাটা সু-সংহত হয়ে যাবে।

বাস্তবমুখী শিক্ষা দেয়া

শিশুদের সাঁতার তথা সন্তরণ বিদ্যা না শেখানো বাঙালী জাতির চূড়ান্ত পর্যায়ের জাতিগত অশিক্ষা। লক্ষ্য করে থাকবেন, অনেক ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আমলা, শিক্ষকদের সন্তানেরাও সাঁতার জানে না। বিশেষকরে শহরের ছেলেরা। তারা কেন অশিক্ষিত হবে? এই বিষয়ে একটু বিশদ ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন মনে করছি। সার্টিফিকেট এবং পদ-পদবির সঙ্গে শিক্ষার কোনো সম্পর্ক নেই। এমনকি শহুরে বাবু হওয়ার সঙ্গেও শিক্ষার কোনো সম্পর্ক নেই। বাঙালির মানসিকতায় যেটা ফুটে উঠে তা হলো, এক সময়ের ভীষণ দরিদ্র এই জাতি পয়সার মুখ দেখে সন্তানদের বাবু বানাতে চায়। অনেকটা সৌদির মতো।

গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরাও এখন সাঁতার শেখে না। পয়সা হলেই দাসী-বাদী নির্ভর বাবুগিরির সংস্কৃতি বিশ্বের কোনো সভ্য দেশে নেই। তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থলের পৃথিবীতে সন্তরণ তথা সাঁতার না শেখানো মানে—সন্তানকে পঙ্গু করে রাখা। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার মৌলিক শিক্ষাগুলো না দেয়াটা আমাদের চিরাচরিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এ জন্য সন্তানদেরকে সাঁতার শিখানো এবং সাইকেল চালানোর শিক্ষা দেয়া সন্তানের জন্য খুবই উপকারী। অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ও বটে। তাছাড়া সন্তরণের সঙ্গে আর কোনো শরীর চর্চার তুলনা চলে না। সাঁতারের মাধ্যমে শরীরের সব পেশি সক্রিয় হয়। পদ-পদবি ও সার্টিফিকেটের সঙ্গে শিক্ষার কোনো সম্পর্ক নেই। সমস্ত একাডেমিক শিক্ষা ভুলে যাওয়ার পর মানুষের মধ্যে যা অবশিষ্ট থাকে সেটাই তার প্রকৃত শিক্ষা। অর্থাৎ জীবনবোধ। বাস্তব জীবনের শিক্ষাই আসল শিক্ষা।

তাই শিক্ষিত হোন। দুনিয়াতে সন্তান এনেছেন, সন্তানকে বেঁচে থাকার কলা কৌশল শেখানো আপনার পদ-পদবির চেয়েও মূল্যবান। না শেখানো মস্ত বড় অপরাধ। অর্থাৎ সন্তরণ বিদ্যা না জানার কারণে কেউ মারা গেলে সেই ব্যক্তির বাবা-মা মূলত তাকে হত্যা করার সমান অপরাধ করেন।

শিশুদেরকে সব সময় তিরষ্কার না করা

শিশুদেরকে সব সময় তিরস্কার না করা উচিত। ছোট ছোট কথার উপর সমালোচনা না করা। যেমন বলা-তোমার এটা ঠিক হয়নি? তুমি এমনটি করলে কেন? ঐ রকম কেন করলে না? ইত্যাদি..। এগুলোকে তারবিয়ত বা পরিচর্যা বলে না। স্মরণ রাখা দরকার যে, 'সমালোচকের প্রয়োজনের থেকে সংস্কারকের প্রয়োজন বেশি'। অর্থাৎ সমালোচক না হয়ে সংশোধনকারী হওয়া উচিত।

মোটকথা, অতিরিক্ত তিরস্কার করার দ্বারা সন্তান অনেক সময় বেপরোয়া হয়ে যায়।

ভালোবাসা দিয়ে সন্তানের মন জয় করা

ভালোবাসা দিয়ে আপনার সন্তানের মন জয় করুন। ভালোবাসা অলৌকিক হিসেবে কাজ করে। নিষ্ঠুরতা, অভিশাপ ও মারধর করে তাকে জয় করতে যাবেন না। এতে আপনি তাকে চিরতরে হারিয়ে ফেলবেন। আপনি তার কাছাকাছি আসুন। তার সাথে কথা বলুন। তার কথা শুনুন। তার সাথে ইতিবাচক থাকুন। তার জন্য দোয়া করুন। এতে আপনি আল্লাহ তাআলার আশির্বাদধন্য ফল দেখতে পাবেন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে হতাশ করবেন না ইনশাআল্লাহ।

সন্তানের সামনে ঝগড়া-বিবাদে না জড়ানো

সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে মৌলিক ভূমিকা রাখে মা-বাবার মধ্যকার রসায়ন। শিশু যদি তার মা'কে দেখে বাবার সাথে প্রতিনিয়ত ঝগড়া করছে। আর বাবাকে দেখে মা'কে কষ্ট দিচ্ছে। এর মন্দ প্রভাব ভয়ানকভাবে সন্তানের উপর পড়বে। অনেক সন্তান কিছু বলতে না পেরে চাপাকান্নায় জর্জরিত হয়। বাবা-মায়ের মধ্যে মনোমালিন্য দেখতে তার ভালো লাগে না। এ বিষয়টি খুব লক্ষ্যণীয়, কখনো ঝগড়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি

হলে অন্তত সন্তানের সামনে সেটা না হওয়া চাই। বিশেষ করে সন্তানের সামনে তার মা'কে অপমান করা বাবার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা শেষ করে দেয়।

সন্তানকে গান-বাজনা থেকে দূরে রাখা

বর্তমান সময় মুসলিম সমাজে এবং নতুন প্রজন্মের মাঝে রেডিও, টেলিভিশন, মোবাইল, ল্যাপটপ ইত্যাদির ব্যবহার খুবই সরগরম। যখন এই ইলেকট্রিক মাধ্যমগুলো থেকে অশ্লীল, কামোদ্দীপক ও যৌন উত্তেজক গান-বাজনা শিশুদের কানে এসে পড়ে তখন স্বভাবিকভাবেই এই কচি মনের সন্তানগুলোর ঈমান-আখলাক অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত হতে থাকে। অনুভূতি শূন্য হয়ে চলা-ফেরা করতে শুরু করে। গুণগুণ করে বেড়ায় পথে-ঘাটে। এক অতৃপ্ত স্বাদ অনুভব করতে থাকে প্রতিনিয়ত। ধীরে ধীরে তাদের কথা-বার্তা ও কাজ-কর্মে ঐসব গানের নোংরামী প্রকাশ পায়। বড়ই আফসো! বর্তমানে আমাদের আচার-অনুষ্ঠানগুলোতে গানের আসর না হলে যেন তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সন্তানরা এসব জায়গা থেকেই গান-বাজনার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এ জন্য পিতা-মাতার এসব বিষয়ে খুব লক্ষ্য রাখতে হবে। এখানে গান-বাজনা সংক্রান্ত কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করছি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'কোন ব্যক্তি যদি গায়ক থেকে গান শুনে স্বাদ অনুভব করে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার কানে গলিত সিসা ঢেলে দিবেন।'

» আবদুর রহমান ইবনু আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'টি আওয়াজ থেকে বারণ করেছেন। এক. গান। দুই. বিলাপ।

» আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—বাজনা অন্তরে ব্যভিচারের কল্পনা সৃষ্টি করে। যেমনিভাবে পানি সতেজতা বৃদ্ধি করে।

» ফুযাইল রাহিমাহুল্লাহু বলেন—গান বাজানো ব্যাভিচারের নামান্তর।

» যাহহাক রাহিমাহুল্লাহু বলেন—গান অন্তরকে নষ্ট করে দেয় এবং আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি বাড়িয়ে দেয়।

» ইয়াযিদ ইবনু ওয়ালিদ রাহিমাহুল্লাহু বলেন, হে বনু ইমাইয়্যাহ! তোমারা গান শোনা থেকে দূরে থাক। কেননা গান যৌনচাহিদা বাড়িয়ে দেয়।

» সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একবার উমর ইবনু কাররা নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে অশ্লীল গানের পরিবর্তে সাধারণ গান বাজানোর অনুমতি চাইলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি তোমাকে কখনোই এর অনুমতি দিব না। তোমাকে না সম্মান করবো আর না করুণা দৃষ্টিতে দেখবো। হে আল্লাহ তাআলার দুশমন! তুমি মিথ্যা বলছো। আল্লাহ তোমাকে হালাল এবং উত্তম রিযিক দান করেছেন। কিন্তু তুমি হারাম গ্রহণ করেছো। আমি যদি তোমাকে প্রথমই নিষেধ করে থাকি তাহলে তো তুমি মন্দরূপে এসেছো। আমার সামনে থেকে চলে যাও। আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবা কর। স্মরণ রেখো, এরপরও যদি তুমি গান বাজাও তাহলে তোমাকে কঠিন শাস্তি দিব। যখন উমর ইবনু কাররা চলে গেল তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এই লোকটি অবাধ্যতাকারী। এর মত যে কেউ তাওবা না করে মৃত্যুবরণ করবে হাশরের দিন আল্লাহ তাকে বস্ত্রহীন করে উঠাবেন।

উপরের এই হাদিসগুলো থেকে বুঝা যায়, আমাদের নিজেদের তো গান-বাজনা থেকে বেঁচে থাকতে হবেই, এমনকি আমাদের সন্তানদেরকেও এর থেকে বঁচিয়ে রাখতে হবে। নতুবা সকলকেই গুনাহগার হতে হবে।

মোবাইল ফোনের অপব্যবহার

বর্তমান সময়ে ইন্টারনেট এবং মোবাইলের অবাধ ব্যবহার নতুন প্রজন্মের চরিত্র ও ঈমানকে এমনভাবে দেউলিয়া করে দিচ্ছে, যা প্রকাশ করার মতো কোন ভাষা আমার নেই। কলম যেন নীরব হয়ে গেছে। বিবেক হারিয়ে

গেছে। যেসব পিতা-মাতা সন্তানদেরকে মোবাইল ও ইন্টারনেটের খোলা ময়দানে ছেড়ে দিয়েছে তারা মূলত সন্তানদেরকে ধ্বংস করার সরঞ্জাম তার হাতে তুলে দিয়েছে।

মাওলানা তাকী উসমানী দা. বা. বলেন—'বর্তমান সময়ে স্মার্ট ফোন হলো সবেচেয় বড় ফিতনা'। অথচ আমাদের নতুন প্রজন্ম এই স্মার্ট ফোন গলায় ঝুলিয়ে অবাধ চলা-ফেরা করে। এই ফোন যেন তার নিঃসঙ্গ জীবনের সাথী। মোবইল স্ক্রিনে ভেসে আসা দূষিত সাইট এবং চরিত্র নষ্টকারী দৃশ্য ঘরের পরিবেশকে সমূলে বিনাশ করে দিচ্ছে।

সুতরাং নিজ সন্তানদেরকে মোবাইল ফোন ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখবেন। যদি খুব বেশি প্রয়োজন হয় তাহলে নিজেদের বিশেষ তদারকিতে ব্যবহার করাবেন। কেননা সন্তানেরা ঐ সমস্ত কাজ গোপনে করে, যেগুলো তারা অসৎ মনে করে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে মোবাইলের ফিতনা থেকে রক্ষা করুন। আমিন।

ভিডিও গেমস

সন্তান ধ্বংস হওয়ার আরেকটি বড় কারণ হলো ভিডিও গেমস। বর্তমান সময়ে ভিডিও গেমসের স্বাধীন ব্যবহার সন্তানদেরকে একেবারে বেপরোয়া করে রেখেছে। এটা অস্বীকার করার কোন সুযোগই নেই। ভিডিও গেমস সন্তান, যুবক, এমনকি বড়দেরও অনিবার্য নেশায় পরিণত হয়েছে। পিতা-মাতারা স্বাভাবিকভাবে ভিডিও গেমসকে একটা বিনোদনমূলক বিষয় মনে করে থাকেন। সময় অতিবাহিত করার জন্য সন্তানদের হাতে ভিডিও গেমস দিয়ে ব্যস্ততার মধ্যে ডুবিয়ে রাখেন। এখন ভিডিও গেমস এতো পরিমাণে বেড়ে গেছে যে, সব শ্রেণীর লোকেরা এর দ্বারা প্রভাবিত। তাদের সকাল-সন্ধ্যা অতিবাহিত হয় এই ভিডিও গেমস খেলে।

অধিকাংশ সন্তানেরা যখন ঘরে কম্পিউটার, ল্যাপটপের মধ্যে বুদ হয়ে থাকে তখন অসচেতন পিতা-মাতা এই ধারণা রাখে যে, সন্তান হয়তো ভালো লাইনেই তা ব্যবহার করছে। অথচ সে ব্যবহার করছে অসৎ

জায়গায়। ধারণা করা হয় যে, আগামীর বিশ্ব ভিডিও গেমসের লীলাভূমিতে পরিণত হবে। এই গেমস খেলতে গিয়ে কত শিশু যে আত্মহত্যা করেছে এর সঠিক কোন সংখ্যা আমার জানা নেই। বর্তমানে কিছু ধ্বংসাত্বক গেমস বের হয়েছে। যেমন—পাবজি, ফ্রী ফায়ার, এ জাতীয় আরো অনেক গেমস রয়েছে। ছোট ছোট সন্তানরা এগুলোর প্রতি আসক্ত হয়ে খাওয়া-দাওয়া, ঘুম-নিদ্রা সব কিছু বিসর্জন দিচ্ছে। এমনকি এ নিয়ে মা-বাবার সাথে মারামারি করতেও দ্বিধাবোধ করছে না। তাই পিতা-মাতার জন্য কর্তব্য হলো, সন্তানদেরকে এই ভুল পথ থেকে দূরে রাখা। তাদেরকে ভালো বইয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা।

শিশুকে ইন্টারনেট থেকে দূরে রাখা

আধুনিক শিক্ষা সহজ হওয়ায় ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো ইন্টারনেটের ধারা এই জন্য শুরু করেছিল যে, শিক্ষার্থীরা যেন খুব সহজেই জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অর্জন করতে পারে। নিঃসন্দেহে তথ্য অর্জন করার অতুলনীল একটি মাধ্যম ইন্টারনেট। তবে অসৎ জায়গায় এর ব্যবহারটাই তুলনামূলক বেশি দেখা যাচ্ছে। শাইতান ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা ইন্টারনেটের অপব্যবহার শুরু করে দিয়েছে। এর মাধ্যমে ছেলে-মেয়ে একে অপরের সাথে হারাম ভালোবাসা বিনিময় করার জন্য চেটিং (বার্তা নিবেদন) করে। বর্তমান সময়ে ফেসবুকে হাজারের অধিক বন্ধু বানানোকে গৌরবের বিষয় মনে করা হয়। অথচ এর বেশির ভাগই থাকে ফেক আইডি। খুব মজা নিয়ে একজন অপরজনের সাথে কথা বলে। অধিকাংশ পিতা-মাতা ধরে নেয় যে, আমার সন্তান সদা সর্বদা পড়া-লেখায় ব্যস্ত থাকে। তার তো খবর নেই যে, সে কম্পিউটারের স্ক্রিনে ঘন্টার পর ঘন্টা নিজ প্রেমিকার সাথে ভালোবাসায় মত্ত হয়ে আছে। এই রোগে কেবল যুবকরাই সীমাবদ্ধ নয়। অনেক ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও এর ভুক্তভোগী। সেও যুবতী মেয়েদের সাথে এভাবে বার্তা বিনিময় করে। যেমন প্রেমিক প্রেমিকার সাথে করে থাকে।

এ কারণেই ফেসবুক, ইন্সটাগ্রাম, টুইটার এ জাতীয় এ্যাপসগুলোর মধ্যে

এই পরিমাণ অসৎ জিনিস যুক্ত থাকে, যা পড়লে বা দেখলে অন্তরের মৃত্যু হয়ে যায়। ইন্টারনেটে ইসলামিক ওয়েবসাইড থাকে। আবার ইসলামের বিপক্ষে কাজ করার জন্য ইয়াহুদী, খ্রিষ্টানদের লোকজনও কুরআন-হাদিসের মধ্যে বিভিন্ন রদ-বদল করে লেখা শেয়ার করে। অনেক সময় এমন লোভও দেখায় যে, এই পরিমাণ লোকদের কাছে শেয়ার করতে পারলে তোমার মোবাইল ব্যালেন্সে এত টাকা চলে আসবে।

অন্যদিকে যুব সমাজ ইন্টারনেটে বিভিন্ন বিষয়ে পড়া-শোনা করে এবং ভিডিও দেখে মনে করে যে, এগুলো ধর্মীয় বিষয়। অথচ ইসলামের সাথে এর নূন্যতমও কোন সম্পর্ক নেই। মোটকথা বুঝা গেল যে, ইন্টারনেট যতটুকু উপকারী তার থেকে ক্ষতির দিকটাই বেশি। এজন্য সন্তানদের ব্যাপারে মা-বাবার সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যে, তারা যেন অপরিপক্ক অবস্থাতেই ইন্টারনেটের অপব্যবহারে জড়িয়ে না পড়ে।

সন্তান প্রতিপালন ও পরিচর্যা নিয়ে ভুল ধারণা

সন্তান লালন-পালন অনেক কষ্টের কাজ! এই কথাটি শোনেননি এমন কেউ নেই। প্রায় মা-বাবাই এমন বলে থাকে। আমাদের আশেপাশের মানুষজন সন্তান হবার আগেই সন্তান প্রতিপালনে এই করতে হবে। সেই করতে হবে এবং তাদের সাথে যত ধরনের বাজে ঘটনা ঘটেছে, কত কিছু ত্যাগ করতে হয়েছে; এমন সব শোনাতে বসে যায়। যা আমাদের চিন্তা-চেতনায় পাহাড়সম বোঝার ন্যায় রূপ ধারণ করে।

সন্তান প্রতিপালন করা অবশ্যই অনেক কষ্টসাধ্য একটি বিষয়, সবারই কষ্ট হয়। কিন্তু এগুলো না বলে যদি নতুন মা-বাবাকে বলা হয়, মা-বাবা হতে পারাটা একটা সৌভাগ্যের বিষয়। সন্তানের সাথে প্রতিনিয়ত যে অলিখিত ভালোবাসার আদান-প্রদান হয়, তার কোনো তুলনাই হতে পারে না। ছোট ছোট হাত পাগুলো ছুঁয়ে দেখা, তার দন্ত বিহীন মাড়ির হাসিতে মন উজ্জ্বল হয়ে ওঠা, হাত ধরে চলতে শেখানো; একেকটা ধাপ পার করা যেন বাবা-মা হিসেবে আমাদেরই একেকটা অর্জন। এই সুন্দর

সুন্দর কথাগুলো সন্তানের প্রতি আরো ইতিবাচক মনোভাব রাখতে সহায়ক হবে।

এই ইতিবাচক মানসিকতা তৈরি করার দিকটা আমরা বরাবরই অগ্রাহ্য করি। আমরা শুধু সন্তানের চাহিদার দিকটা মাথায় রাখি। তাই তাদের ঠেলে-ঠুসে খাওয়াচ্ছি। গাদা-গাদা কাপড় কিনে দিচ্ছি আর নিজের মন মতো আচরণ না পেলে তার প্রতি অনাগ্রহী হয়ে পড়ছি। কেমন যেন অটো পাইলট মুডে সন্তানকে খাওয়াচ্ছি। ঘুম পাড়াচ্ছি। গোসল করাচ্ছি। এর ভেতর নিজেকে ও সন্তানকে বেঁধে ফেলছি। কিন্তু এর মাঝে সন্তানের মুখ পানে চেয়ে এক টুকরো হাসি আনন্দ করা, এবং সন্তানের সাথে নিজের জীবনকে উৎসবমুখর করে তোলার কোনো চেষ্টাই আমরা করি না। আমরা সেই পুরনো নেতিবাচক চিন্তাধারার গোলক ধাঁধায় নিজেদেরকে আবদ্ধ করে ফেলি। আল্লাহ আমাদেরকে চিন্তার প্রসারতা দান করুন।

সন্তানের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন

১.আপনার শিশুকে কারো কোলে বসতে দিবেন না।

২. সন্তানের বয়স দু'বছরের বেশি হলেই তার সামনে আপনি আর কাপড়-চোপড় পাল্টাবেন না।

৩. আপনার শিশু যখন বলছে সে খেলতে যাচ্ছে। সে কোন ধরণের খেলাতে নিমজ্জিত হচ্ছে সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। উঠতি বয়সী সন্তানদের মধ্যে কিছুটা যৌনতার প্রবণতা পাওয়া যায়।

৪. স্বাচ্ছন্দবোধ করছে না এমন কারো সাথে কোথাও যেতে আপনার শিশুকে জোরাজুরি করবেন না। পাশাপাশি লক্ষ্য রাখুন, আপনার শিশু প্রাপ্ত বয়স্কের ভক্ত হয়ে উঠছে কিনা?

৫. দারুণ প্রাণচ্ছল কোন শিশু হঠাৎ নির্জিব হয়ে গেলে, তাকে প্রশ্ন করুন। তার মনের অবস্থাটা পড়তে চেষ্টা করুন।

৬. সর্বপ্রকার ছবি, কার্টুন ইত্যাদি থেকে সন্তানদেরকে যথাসম্ভব দূরে রাখুন।

৭. বইয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে পূর্ণ অবগত হয়েই তা কোমলমতি সন্তানের হাতে দিন।

৮. আপনার শিশুকে ভিড়ের বাইরে দাঁড়ানোর মূল্যবোধ শেখান।

৯. আপনার শিশু যদি কারো ব্যাপারে কোনো অভিযোগ করে, তবে দয়করে বিষয়টি নিয়ে মোটেও মুখ বুজে থাকবেন না।

১০. আপনার ছেলের চরিত্র নষ্ট হতে পারে এমন লোকের সাথে মেলামেশা করা থেকে বিরত রাখুন।

মনে রাখবেন, বর্তমানে আপনি হয়তো কোন সন্তানের বাবা-মা অথবা দু'দিন বাদে কারো বাবা-মা হবেন। সন্তান বাধ্য না হওয়ার ব্যথা কিন্তু সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হবে। আপনার সচেতনতাই আপনার পবিারের নিরাপত্তা।

রাগ হলে কি করবেন?

রাগ প্রতিটা মানুষের মধ্যেই আছে। কারো মধ্যে বেশি, কারো মধ্যে কম। তবে রাগকে যে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সেই হলো সবচেয়ে বড় বীর। সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে আমাদের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক। অন্যথায় হীতে বিপরীত হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা রয়েছ। প্রচণ্ড রাগের মাথায় আমরা অনেক সময় অনেক কিছুই বলে ফেলি, যেমন—আপনি রাগ করে বললেন, মর তুই। ফেরেশতা বলল, 'আমিন'। অথবা বললেন, তোর ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ফেরেশতা বলল 'আমিন'। আপনি রাগ করে বললেন, তোর মুখ আমি দেখতে চাই না। ফেরেশতা বলল 'আমিন'।

আপনি রাগ করে বললেন, জীবনে স্বামীর ভাত খেতে পারবি না, ফেরেশতা বলল, 'আমিন'।

আপনি রাগ করে বললেন, মরার সময় তুই পানি পাবি না। ফেরেশতা বলল, 'আমিন'।

আপনি রাগ করে বললেন, তুই এবার ফেল নিশ্চিত। ফেরেশতা বলল,

'আমিন'। আপনি রাগ করে বললেন, আমার মৃত মুখ দেখবি। ফেরেশতা বলল, 'আমিন' আপনিই তো সেই মানুষ, যে সন্তানকে সবচে' ভালোবাসেন। জীবনে এর চেয়ে বেশি ভালো কাউকে বাসেননি এমনকি নিজেকেও না।

আপনিই তো সেই মানুষ, যার চেয়ে আন্তরিক দু'আ এই পৃথিবীতে তার জন্যে কেউ করবে না। এমনকি সে নিজেও না।

স্বাভাবিকতই মুসলমানের সব কথার শেষে ফেরেশতাগণ আমিন আমিন বলেন। আর সন্তানের জন্য বাবা-মা'র মুখ থেকে বের হওয়া প্রতিটি শব্দ খুব শক্তিশালী। আসুন এর মর্যাদা বুঝি। এর অপব্যবহার না করি। খুবই কষ্ট পাই অনেক বাবা-মা'র ভাষা শুনে অবাক হই। ভাবতে থাকি এদেরকেও আল্লাহ্ সন্তান দান করেন!

হ্যাঁ, সন্তান অন্যায় করেছে। মা-বাবা হিসেবে এ ধরনের অশ্লীল ভাষা ব্যবহার না করে আসুন বলি, আল্লাহ তোমাকে হিদায়াত দিন। আমার জন্য চক্ষু শীতলকারি বানান। অথবা বলতে পারেন—

আল্লাহ তোমাকে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মত বানান।

আল্লাহ তোমাকে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর মত বানান।

আল্লাহ তোমাকে কাবা ঘরের ইমাম বানান। আল্লাহুম্মা আমিন!

রাগের সময়ও আমাদের এ জাতীয় কথা বলা। অভিশাপ দেয়া কিংবা এ জাতীয় কথা-বার্তা অনেক সময় কবুল হয়ে যায়। যখনই নিজের ভিতর রাগ উপলব্ধি করবেন বা বুঝবেন রাগ উঠে যাচ্ছে অথবা মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে, তখন শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে বাঁচার জন্য 'আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম' মনে মনে পড়তে থাকবেন। দেখবেন, নিজের প্রতি নিজের নিয়ন্ত্রণ চলে আসবে ইনশাআল্লাহ।

শিশু প্রহার অনৈসলামিক ও অন্যায় কাজ

বাবা মা'য়ের প্রতি অনুরোধ, নিজ ছেলে মেয়েদেরকে এমন শাসন বা এমন চাপ দেবেন না, যা তার জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। অথবা টেনে আনতে পারে এক অভিশপ্ত কালো অধ্যায়। সন্তান অমূল্য সম্পদ। আপনার জন্য প্রতিযোগিতার ঘোড়া নয়।

আমরা যে কাল অতিবাহিত করে এসেছি, একাল-সেকাল নয়। আমাদের স্কুল বা মাদরাসা থেকে ফেরার পর শরীরে শিক্ষকের বেতের দাগ দেখে মা খুশি হতেন। বাবা হাত পা বেঁধে, মেরে খাটের নিচে ফেলে রাখতেন দুষ্টোমির জন্য।

একটা থাপ্পড়ও দিতে পারবেন না এখনকার সন্তানদের গায়ে। স্কুলে শিক্ষকেরা অন্য সন্তানদের সামনে কাউকে বকলে বা সামান্য প্রহার করলেও তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যায়। এটাই যুগের পরিবর্তন। মেনে নিতেই হবে। আমি এক সন্তানকে জানি, স্কুলে একবার দুষ্টামি করার জন্য শিক্ষক তাকে সিটের উপর দাঁড় করিয়ে রেখেছিল কিছুক্ষণের জন্য। বহুদিন ভগ্ন হৃদয় ছিল সন্তানটি। স্কুলেই যেতে চাইত না।

আমাদের স্কুল জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে সিটের উপর দাঁড়িয়েই। মাঝে মাঝে এক পায়ে দাঁড়িয়ে। বসার সময় কম পেয়েছি।

যুগের পরিবর্তন। সন্তানকে আদর দিয়ে ছোটবেলা থেকেই ভাল মন্দ শিখাবেন। শিখাবেন সত্য মিথ্যা। তাদেরকে সত্যবাদী করে তুলবেন। স্বাচ্ছন্দ্যময় একটা সিস্টেমের মধ্য দিয়ে ওদেরকে দেখাশুনা করতে হবে। উদাসীনভাবে ছেড়ে দেয়া নিতান্তই নির্বুদ্ধিতা ও দায়িত্বহীনতার আলামত। তাদেরকে ভাল মানুষ বানানোর প্রবল ইচ্ছা ও কার্যকরী মাধ্যম থাকতে হবে যেন সন্তান আদর্শ সন্তান হয়ে বড় হতে থাকে। পরবর্তীতে সেই হবে জাতীর কর্ণধার।

তাছাড়া শরীয়তের দৃষ্টিতে শিশুরা গায়রে মুকাল্লাফ তথা দায়ভার ও

জবাবদিহিতা থেকে মুক্ত। তারা শারীরিকভাবে যেমন দুর্বল তেমনি মানসিকভাবেও কোমল। তাই তাদের সাথে কোমল ও নরম আচরণ করতে হবে। তাদেরকে শিক্ষাদান করতে হবে মায়ের স্নেহ-মমতা দিয়ে। এক্ষেত্রে ধমক ও কঠোরতা পরিহার করে নম্রতা ও কোমলতা অবলম্বন করতে হবে। যে নম্রতা ও কোমলতার আচরণ করতেন মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সবার সাথেই করতেন, রাগান্বিত অবস্থায় শিশুদের প্রহার করা অন্যায়। স্বভাব-প্রকৃতির কারণেই শিশুরা অন্যদের চেয়ে ব্যতিক্রম। তাই শিশুদের শিক্ষাদান খুবই কঠিন। শান্ত-শিষ্টতার চেয়ে চপলতা ও চঞ্চলতাই তাদের মধ্যে প্রবল। ফলে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করাও বেশ কষ্টকর।

কখনো কখনো পরিস্থিতি এমন হয়ে যায় যে, মা-বাবার মধ্যে ক্রোধের ভাব সৃষ্টি হয়ে যায় এবং প্রহার করার অবস্থা সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় শাস্তি দেয়া উচিত নয়। আবারো বলা হচ্ছে—এ সময় শাস্তি দিবেন না; বরং নীরব-নিশ্চুপ থেকে নিজের রাগ দূর করবেন। তারপর করণীয় নির্ধারণ করবেন। এটাই ইসলামের শাশ্বত শিক্ষা ও ধর্মীয় নির্দেশনা।

মুফতি মুহাম্মাদ শফি রাহিমাহুল্লাহু বলেন, শিশুদেরকে প্রহার করা খুবই ভয়াবহ কাজ। অন্যান্য গুনাহ তো তওবার মাধ্যমে ক্ষমা হতে পারে। কিন্তু শিশুদের উপর জুলুম করা হলে এর ক্ষমা পাওয়া খুবই জটিল। কেননা এটা হচ্ছে বান্দার হক। আর বান্দার হক শুধু তওবার দ্বারা ক্ষমা হয় না। যে পর্যন্ত না যার হক নষ্ট করা হয়েছে সে ক্ষমা না করে। এদিকে যার উপর অন্যায় করা হয়েছে সে হচ্ছে নাবালেগ। নাবালেগের ক্ষমা শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্য এ অপরাধের ক্ষমা পাওয়া খুবই কঠিন। আর তাই শিশুদেরকে প্রহার করা এবং তাদের সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করার বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনু খালদুন রাহিমাহুল্লাহু বলেন, 'খুব বেশি স্মরণ রাখবেন। শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে প্রহার করা এবং ধমক দেয়া

শিশুদের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এটা উস্তাদের অযোগ্যতা ও ভুল শিক্ষা পদ্ধতির নমুনা। প্রহার করার ফলে শিশুদের মনে শিক্ষকের কঠোরতার প্রভাব বিরাজ করে। তাদের মন-মানসিকতায় আতঙ্ক সৃষ্টি হয় এবং তারা লেখাপড়ার উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। কঠোরতা তাদেরকে অধঃপতনমুখী করে তোলে। অনেক সময় তাদের মস্তিষ্কের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রহার ও কঠোরতার কারণে শিশুদের মাঝে মিথ্যা বলা ও দুষ্কর্মের মানসিকতা সৃষ্টি হয়। তাদের আত্মমর্যাদাবোধ ও উচ্চ চেতনা দূর হয়ে যায়। শিক্ষকের মারধর থেকে বাঁচার জন্য তারা নানা অপকৌশল, মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে। পরবর্তীতে এই সকল ত্রুটি তাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে যায়। উত্তম চরিত্র ও সুন্দর মানসিকতার পরিবর্তে অসৎ চরিত্র ও অনৈতিকতার ভিত রচিত হয়।

মোটকথা, শাসন একেবারেই না করা যেমন উচিত নয়। তেমনি কড়া শাসনও উচিত নয়। শিশুর মনে ভয় তৈরি করলে সে কিছু শিখতে পারে না। তার মানসিক গঠন পরিপূর্ণতা পায় না। কোন কাজ নিজে নিজে ঠিকমতো করতে পারে না। বড় হয়ে স্বাবলম্বী হতে পারে না। বরং নির্ভরশীল হয়ে ওঠে।

আরেকটি কথা মনে রাখবেন, টিভি, কম্পিউটার, মোবাইল সবই জড় পদার্থ। এসব থেকে শিশু কোন মানবিক গুণাবলি শিখতে পারে না। ফলে অনুভূতিহীন যান্ত্রিক মানবে পরিণত হয়। মাটির সাথে নাড়ীর টান বিচ্ছিন্ন হয়। শিশুকে প্রকৃতির কাছাকাছি নিতে হবে। ঘাসের স্পর্শ চেনাতে হবে, ফুলের ঘ্রাণ চেনাতে হবে, সবুজ পাতার রং চেনাতে হবে, আকাশ নদীর রং চেনাতে হবে। তবেই সে মানবিক হবে, জীবনটাকে রঙিন করতে শিখবে, কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি পাবে। নতুন কিছু আবিষ্কারের নেশায় মাতবে। অন্ধকার দূর হয়ে পৃথিবী আলোকিত হবে।

ভালো কিছু পেতে হলে, নিজের ভালোটা বিলিয়ে দিতে হবে। পৃথিবী বাসযোগ্য করতে হলে, শিশুকে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। যন্ত্রের আধুনিকীকরণ নয়।

প্রতিশোধ থেকে বাঁচুন

পিতা ছেলে, মা সন্তান, কিংবা ভাই বোন এমনকি প্রতিবেশী! সবার প্রতিই সবার কিছু না কিছু অভিযোগ থেকেই যায়।

যখন একটি সন্তান ছোট থাকে তখন সে তার পিতা-মাতার উপর নির্ভরশীল থাকে। সেই সময় যদি তাঁর পিতা মাতা তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, অবিচার করে, কিংবা স্নেহ-ভালোবাসা থেকে তাকে বঞ্চিত রাখে তাহলে এক সময় সন্তানও পিতা মাতাকে তার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত রাখবে। আর এটাই জীবনের সোজা গণিত। কেননা আপনি যখন দুর্বল থাকবেন তখন যদি কেউ আপনাকে পীড়া দেয়, আঘাত করে অথবা আপনার উপর অত্যাচার করে; হয়তো এখন আপনি প্রতিবাদ করতে পারবেন না! কারণ আপনি দুর্বল। কিন্তু যখন আপনি সবল শক্তিশালী হবেন তখন নিশ্চয়ই আপনি প্রতিবাদ করবেন। আপনার দুর্বলতার সময় সে যেমনিভাবে আপনাকে আঘাত করেছে আপনিও ঠিক তেমনিভাবে তাকে আঘাত করবেন। একই ধারাতে সন্তানেরাও পিতা মাতার উপর সেই ভাবেই অত্যাচার করে। তাই বলি, আপনি আপনার সন্তানের সাথে কেমন ব্যবহার করছেন একটু মনোযোগ সহকারে দেখে নিন! এবং আপনি আপনার ছোট ভাই-বোন কিংবা প্রতিবেশীদের দুর্বল মানুষগুলোর সাথে কেমন আচরণ করছেন এটাও দেখে নিন! কেননা এখন আপনার শরীরে যেই শক্তি আছে, আপনার যেই অর্থ সম্পদ রয়েছে তা হয়তো একদিন থাকবে না! সময়ের হাত ধরে চলে যাবে। কিন্তু আপনার আচরণ গুলো তাঁদের মনে ঠিকই থেকে যাবে।

বাবা-মা'র কোন আচরণগুলো গ্রহণযোগ্য নয়?

১. সন্তান কোনো ভুল করলে তা যদি স্বীকারও করে, তাও তাকে ভুলের জন্য সারাক্ষণ বকাঝকা করা ও পরবর্তীতে ঐ ভুলের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে খোঁটা মারা। এতে সন্তান পরবর্তীতে কোন ভুল করলে জানাবে না। লুকাবে বা মিথ্যা কথা বলবে এটা সে করেনি।

২. অন্য মানুষের সামনে নিজ সন্তানকে মারধর করা ঠিক নয়। এতে সন্তানের আত্মসম্মানবোধ ক্ষুন্ন হয়। অথবা সবসময় একটা ভয়-ভীতি তার ভেতর কাজ করে।

৩. কঠিন নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে বেঁধে দিয়ে তা পালন করতে সহায়তা না করা। অথচ চালচলন নিয়ম মতো না হলে শুধু শাস্তির বিধান রাখা।

৪. শুধু কড়া শাসনে রেখে নয়; সন্তানকে মাঝে মাঝে বুকে টেনে নিয়ে আদর করে বলা যে, আপনি তাকে কতটা ভালোবাসেন। এরকম না করলে সন্তানের সাথে মানসিক দুরত্ব সৃষ্টি হবে।

৫. সন্তান তার যে কোন নাজুক সময়ে সহানুভূতি চায়। অনেক সময় মানসিক চাপ কাটাতে সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। বাইরের যেকোন বৈরী পরিস্থিতি হোক। হোক তা স্কুলের পরীক্ষা বা বন্ধুদের বিরূপ আচরণ। সন্তান সব সময় চায় কেউ তাকে সান্ত্বনা দিক বা সাহস যোগাক। এ কাজে বাবা-মা'কেই এগিয়ে আসতে হবে।

৬. সবচেয়ে মারত্মক ভুল হলো, অন্য সন্তানদের সাথে বা অন্যের সন্তানদের সাথে তুলনা করা। এতে তার নিজের গুণাবলিগুলো চাপা পড়ে যায়। তার ব্যক্তিত্বও গড়ে ওঠে না।

৭. কোন রুটিন ছাড়া এলোমেলো জীবন সন্তানকে সঠিক ভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে না। নিজের কাজ নিজে গুছিয়ে করতে না শেখালে বড় হয়ে সন্তানকে কর্মক্ষেত্রে বা সংসার জীবনে মানিয়ে চলতে বিপদে পড়তে হয়।

৮. সন্তানের ছোট ছোট সাফল্যকে প্রশংসা না করলে বা পুরস্কৃত না করলে তার গুণগুলো অংকুরেই বিনষ্ট হয়। ভালো কাজে নিরুৎসাহিত বোধ করে।

৯. সন্তানের ইচ্ছেগুলোকে প্রাধান্য না দিলে বা যে কাজে তার উৎসাহ বেশী সেটা তাকে করতে বাধা দিলে অথবা অপছন্দের কিছু বেছে নিতে বাধ্য করা হলে সে কখনোই জীবনে সফল হতে পারবে না।

১০. বেশী সুরক্ষিত রাখতে যেয়ে সব সময় চোখে চোখে রাখা। চোখের আড়াল হতে না দেয়া এবং তার ব্যক্তি স্বাধীনতায় অধিক হস্তক্ষেপ করাও কিন্তু ঠিক নয়। এতে সন্তান পরনির্ভরশীল হয় এবং নিজের দায়িত্ব নিজে সম্পাদিত করতে অপারগ হয়।

১১. সন্তানকে কোয়ালিটি টাইম অর্থাৎ সন্তানের প্রতি নিরবিচ্ছিন্নভাবে মনোযোগ দিয়ে তার সঙ্গে নির্দিষ্ট কিছু সময় না দেয়া অথবা তার সামনে নিজেকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপনে ব্যর্থ হওয়াও সন্তানের ভবিষ্যৎ ভাল না হবার একটি অন্যতম কারণ।

১২. সন্তানকে কোন দায়িত্ব দিতে আস্থা না পেলে বা তার সামর্থ্যকে সন্দেহ করা হলে সে কখনোই স্বাবলম্বী হতে পারবে না।

১৩. সর্বোপরি, প্রয়োজনের সময় সন্তানের কোনো অন্যায় কাজকে শাসন না করে উল্টো তাকে সমর্থন করা, প্রশ্রয় দেয়া ও সন্তানের উপর অন্ধ বিশ্বাস করে তার দোষগুলোকে লুকানো অনেক ক্ষেত্রেই ভবিষ্যতে বিপদ ডেকে আনে এবং এগুলো জীবন সংশয়ের কারণও হতে পারে।

বাবা-মায়ের সঠিক দিকনির্দেশনা না পেলে কি হয়?

বাবা-মায়ের সঠিক দিকনির্দেশনা যদি সন্তান না পায় তাহলে তার মধ্যে যেসব লক্ষণ দেখা যায় তা নিম্মে উল্লেখ করা হলো—

১. অসামাজিক হয়।

২. সহজে নিজের আবেগ, রাগ ও অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয় এবং অকারণে ঝগড়া ও মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে।

৩. বিষন্নতা ও আত্মহত্যা প্রবণ হয়।

৪. উশৃঙ্খল ও উগ্র আচরণকারী হয়।

৫. অন্যদের সাথে ভালো আচরণে ও সহানুভূতি না দেখাতে ব্যর্থ হয়।

৬. সম্পর্কে জড়ানোর চেয়ে ভাঙতেই বেশি আগ্রহী হয়।

৭. বার বার বিশ্বাস ভঙ্গ হবার কারণে নিজের পরিবারের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে ব্যর্থ ও বৃদ্ধ পিতামাতাকে বর্জনকারী হয়।

সঠিকভাবে সন্তান পালনের উপায়

১. সন্তানের জীবনের সব ছোট বড় পরিবর্তন ও ঘটনার খোঁজ রাখা এবং নিজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বা উদাহরণ দিয়ে সন্তানকে সঠিক পথে পরিচালিত করা।

২. কখনোই নিয়ন্ত্রণ হারাবেন না ও রেগে গিয়ে চিৎকার করবেন না।

৩. সন্তানের কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিলে কেন ও কি আশা করছেন তার কাছ থেকে অবশ্যই তাকে বুঝিয়ে বলুন।

৪. নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন এবং তাকে তা মানতে সহায়তা করুন।

৫. সন্তানকে স্বাধীনতা সে কি চায়। আপনার সাথে না মিললে তাকে বুঝিয়ে বলুন, আপনি কি চাচ্ছেন।

৬. তার জন্য উত্তম আদর্শ হওয়ার চেষ্টা করুন। আপনি নিয়ম মেনে চললে, ব্যবহার ভালো করলে অথবা কোন অন্যায় আচরণ না করলে সন্তান আপনাকে দেখেই শিখে ফেলবে।

৭. কখনোই গায়ে হাত তুলবেন না। শাস্তি দিতে হলে অন্য কোনভাবে দিন। এ ক্ষেত্রে শাস্তিকালীন সময়ে শাস্তি হিসেবে তাকে তার পছন্দের জিনিস দেয়া থেকে বিরত থাকুন। সারাদিন ঘরে বসিয়ে বই পড়ানো ইত্যাদি পন্থাগুলো অবলম্বন করুন। ভালো কাজে অবশ্যই পুরস্কার দিবেন।

৮. সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে, সন্তান কি বলতে চায় তার মনের ভাবগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনুন। তার সবকথার মনোযোগী শ্রোতা হিসেবে সময় দিন। ভালো সন্তান পেতে হলে আগে নিজে ভালো পিতামাতা হওয়ার চেষ্টা করুন। একতাল কাদামাটির মতো সন্তানকে কি গড়বেন তা আপনারই হাতে।

কাজের মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস অর্জন

আত্মবিশ্বাস এমন একটি গুণ, যেটার উপর ভর করে মানুষ খুব সহজেই সাফল্য অর্জন করতে পারে। একটা মানুষের জন্য আত্মবিশ্বাসী হওয়া আবশ্যকীয় বিষয়। আর এই আত্মবিশ্বাসটাই প্রতিটা মানুষের ছোট কাল থেকেই বাড়ানো দরকার। সন্তানকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলার জন্য বাবা-মাকেই সাহায্যকারী হিসেবে অগ্রণী ভুমিকা পালন করতে হবে।

কাজের মাধ্যমেও আত্মবিশ্বাস অর্জন করা সম্ভব। সন্তানদেরকে ছোট ছোট কাজ শিখিয়েও কিন্তু আত্মবিশ্বাস বাড়ানো যায়। যার মাধ্যমে সন্তান নিজের প্রতি আস্থা রাখতে শিখবে।

অনেকের ধারণা, আমরা বলে থাকি, ছোট সন্তানদের কষ্ট দিয়ে কাজ শেখানোর কি দরকার? বড় হলে তো এমনিতেই শিখবে! কিন্তু অনেকে বুঝতেই পারে না; ছোট থাকতে কাজ না শিখিয়ে বড় হয়ে হঠাৎ করে কাজ করতে গিয়ে অনেকেই মাত্রাতীত মানসিক চাপে পড়ে যায়। অনেক কাজ আনন্দের সহিতও শেখা যায় এটা অনেকেই মানতে চায় না। যদি কেউ চায় আনন্দ ও উৎফুল্লভাবেও কাজ শিখানো সম্ভব! সন্তানদের কাজের প্রশংসার মাধ্যমেও কাজ শেখানো খুব উপকারী একটা মাধ্যম। ছোট বড় সবাই চায় কেউ তার কাজের মূল্যায়ন বা প্রশংসা করুক। এতে তার উৎসাহ আরো অনেকগুণে বৃদ্ধি পাবে।

কাজ শেখানো মানেই কিন্তু সন্তানকে এটা বলা না যে, এই কাজ টা করো। তোমার জামাটা তোমাকে একাই পড়তে হবে বা মায়ের সাথে কাজ করো! বরং কথার মাধ্যমেও উৎসাহিত করে কাজ শিখানো যায়। সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলা। মিষ্টি ভাষায় কথা বলা। বিভিন্ন কৌশলে সাহায্য চাওয়া বা আত্মতৃপ্তির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া। যেমন, সন্তানকে এভাবে বলা যেতে পারে, চলো মাকে কাজে সাহায্য করি অথবা খেলনাগুলো একসাথে গুছিয়ে রাখি। ছোট কোন কাজ নিজে নিজে করলে সন্তানকে ধন্যবাদ দেয়া এবং সাথে বলা, মাশাআল্লাহ! অবশ্যই তুমি এই কাজটি করতে পারো। এই যে সন্তানকে 'ধন্যবাদ 'দেয়া বা 'তুমি পারো'

এই কথাগুলোই একটা সন্তানকে অনুপ্রাণিত করার জন্য যথেষ্ট।

আমার সন্তানকে আমি প্রথম দুই বছর বয়সে আমাকে সাহায্য করার জন্য উৎসাহিত করেছিলাম। বলেছিলাম আব্বু! তোমার আম্মু অসুস্থ। তুমি বালতি থেকে কাপড় দিয়ে আম্মুকে সাহায্য করো। তাহলে মায়ের জন্য নাড়তে সুবিধা হবে। ছেলে খুব খুশি হয়েছিলো। কারণ তার আম্মু তাকে কাজ করতে দিচ্ছে। এই যে, আমি তাকে সাহায্য করতে বললাম। এই একটি কাজ করার মাধ্যমে সে কিন্তু অনেক কিছু শিখলো। যেমন—

১. কেউ সমস্যায় পড়লে তাকে সাহায্য করতে হয়।

২. মাকে সাহায্য করা উচিত।

৩. সাহায্য করার মাধ্যমে আত্মতৃপ্তি পাওয়া যায়।

৪.আত্মবিশ্বাস অর্জন হয়।

৫.মানবিকতা শিক্ষা পাওয়া যায়।

৬.দায়িত্বশীলতা বুঝে আসে।

সাধারণত মায়েরা সন্তানকে কাজ করতে দিতে চায় না। সাথে সাথে মুখেও বলে দেয় যে, 'তুমি পারবে না অথবা এখানে এসো না বা চলে যাও'। এতে স্বাভাবিকভাবেই সন্তান কাজের প্রতি নিরুৎসাহিত হয়ে যায়। সাথে সাথে তাদের নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাসও কমে যায়। কারণ তারা তাদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত মানুষের কাছ থেকেই শুনেছে, 'তুমি পারবে না'। এই একটা শব্দই তার জন্য আত্মবিশ্বাসী হওয়ার পথে অন্তরায় হওয়ার জন্য যথেষ্ট। ঠিক যেমনটি 'তুমি করতে পারো' কথাটি একজনকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে সক্ষম।

আসলে নিজের ছোট ছোট কাজ; যেমন—জামা, পাজামা পরিধান করা। নিজের হাতে খাওয়া। জুতা পরা, মা'কে ছোট ছোট কাজে সাহায্য করা ইত্যাদি, এরকম কাজগুলো করতে পারার মাধ্যমে কিন্তু সন্তানরা আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারে। যদি বাবা মায়েরা চায়!

অনেকে অভিযোগ করে থাকে যে, মুরব্বিদের জন্য কাজ শেখানো যায় না বা কাজ শেখালে সবাই বলবে, এতটুকু সন্তানকে দিয়ে কাজ করায়! কেউ এই ধরনের কথা বললে আমি বলেছি, 'সন্তানকে কাজ শেখাই এজন্য যে, আমি চাই আমার অবর্তমানে সন্তান যেন নিজেকে সামলাতে পারে এবং কারো জন্য বোঝা না হয়ে যায়। আমি এটাও চাই না যে, সন্তানের সব কাজ করে দিবে। নিজের কাজও করবে। পরবর্তীতে মনের অজান্তেই কাজের চাপে সন্তানের প্রতি বিরক্তিভাব চলে আসবে।

এই আত্মতৃপ্তি, দায়িত্ববোধ এবং মানবিকতা এগুলো কিন্তু এক দিনেই হয়ে যায়নি। তার বয়স যখন দুই বছর, তখন থেকেই শুরু করেছি। চার বছর বয়সে এসে একা একাই গুণগুলো তার মধ্যে চলে এসেছে।

আগে পড়াশোনা নাকি শেখা

পড়াশোনার আগে কিভাবে শিখতে হয়, এটা জানাটা বেশি জরুরী। আজকাল পড়াশোনা নিয়ে খুব চিন্তা-ভাবনা চলছে। বিশেষকরে অনেক মায়েরা অভিযোগ জানাচ্ছে যে, দুই বছর তিন মাসের বা তিন বছরের সন্তানরা পড়াশোনায় মনোযোগী না। কিভাবে তাদের মনোযোগ বাড়ানো যায়? আসলেই কি দু'তিন বছরের সন্তানরা পড়া-লেখাতে মনোযোগী হতে পারে নাকি তাদেরকে শেখাতে হয়; কিভাবে মনোযোগ দিতে হয়?

আমাদের দেশের বাবা-মায়েরা দু'তিন বছরের সন্তানদের পড়ালেখা নিয়ে যে পরিমান টেনশন করে অন্য দেশের অভিভাবকরা বোধহয় এতো টেনশন করে না। তবে পড়াশোনার আগে কিছু জিনিস আছে যেগুলো পড়াশোনার পূর্বেই অন্যান্য দেশের অভিভাবকগণ শেখানোটা বেশি জরুরী মনে করে। এবার আসি মূল কথায়,

এক বোনের বর্ণনা, তিনি বলেন, আমার সন্তানকে সাউথ কোরিয়াতে চার বছর বয়সে প্রি-স্কুলে দিয়েছি। ওখানে কিন্তু ছোট সন্তানদের জন্য পড়ালেখার চেয়ে অন্য তিনটি বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। যেহেতু ওদের দেশে ছয় বছর বয়স থেকেই পড়ালেখার আসল ব্যাপারটা শুরু

হয়। তার আগে সন্তানদের যা শেখানো হয়—

১. আত্মনির্ভরশীলতা।

২.আত্মবিশ্বাস।

৩. সুরক্ষা পদ্ধতি ও শিষ্ঠাচার।

৪. সর্বশেষে পড়ালেখা।

পড়ালেখা কিন্তু সবার শেষে প্রাধান্য পাচ্ছে। সন্তানরা যখন স্কুলে যাবে তখন কিন্তু পড়ালেখা একটা বয়স ঠিকই শিখে যাবে। আর সন্তান যখন আত্নবিশ্বাসী এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠবে তখন তাদের জন্য পড়ালেখা শেখাটা আপনা-আপনি-ই সহজ হয়ে উঠবে। আর সাথে সাথে কিছু সুরক্ষা পদ্ধতি ও শিষ্ঠাচারও শেখানো।

তারা কিভাবে এই ছোট ছোট সন্তানকে আত্নবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল করে তুলছে। সন্তানগুলোকে নিজের ছোট ছোট কাজ গুলো আগে শেখানো হচ্ছে। যেমন—নিজের হাতে খাওয়া। নিজের জুতা, জামা, প্যান্ট নিজেই পরিধান করা। এই যে নিজের কাজ নিজে করে তারা যখন আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠছে, তখন কিন্তু তারা আপনা-আপনিই আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছে। আর যখন আত্নবিশ্বাসী হয়ে উঠছে তখন কিন্তু ওদের দ্বারা সব কাজ করাই সম্ভব হয়ে যাচ্ছে।

সুরক্ষা পদ্ধতি ও শিষ্ঠাচার শিক্ষা এই দুটো কাজের মাধ্যমে সন্তান মানুষের সাথে ভদ্রতার সহিত মিশতে পারা শিখবে। কখনো কোন বিপদ আসলে কিভাবে নিজেকে মোকাবেলা করতে হয় তা শিখবে। যা আমাদের জীবনকে এগিয়ে নেয়ার জন্য খুবই আবশ্যক। যেমন—বড়দের সাথে কেমন আচরণ হবে। কারো সাথে দেখা হলে কিভাবে সম্ভাষণ করতে হবে, ভালো মন্দের পার্থক্য বুঝিয়ে বলা ইত্যাদি। যেমনিভাবে এরকম শিষ্ঠাচার শেখানো হয়, ঠিক তেমনিভাবে বিভিন্ন বিষয়ের সুরক্ষা পদ্ধতিও শেখানো হয়। যেমন, কোথাও কেটে গেলে ব্যান্ডেজ লাগাতে হয়। পুড়ে গেলে আক্রান্ত স্থানে ঠান্ডা পানি বা বরফ দিতে হয়। আগুন লাগলে

কিভাবে নিজেকে রক্ষা করতে হয়, ইমার্জেন্সিতে কিভাবে কল দিতে হয় ইত্যাদি। এরকম বিভিন্ন সুরক্ষা পদ্ধতি সন্তানদের ধারনা দেয়া হয়।

তারপর আসে পড়ালেখা শেখানোর বিষয় নিয়ে। এইযে তারা পড়ালেখা শেখায়; এটাও সন্তানদের আনন্দের সাথে শেখায়। খেলার ছলে শেখায় এবং একেবারেই অল্প অল্প করে শেখায়। যেমন, একদিনে শুধু দুইটা শব্দ শেখালো। আবার যে বইটা পড়াচ্ছে সেই বইয়ের চরিত্রগুলো ছেলে মেয়েদের মধ্যে ধারন করে দিচ্ছে। যেন ওরা আগ্রহী হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্যি, আমরা অভিভাবকরা উল্লেখিত প্রথম তিনটিকে বাদ দিয়ে চার নাম্বারটাতে ঝাপিয়ে পড়ি। সরাসরি বই দিয়ে জোর করে পড়তে বসাতে চাই। যার দরুণ সন্তানগুলো আগ্রহ-ই হারিয়ে ফেলে। তাইতো সন্তানদের মনোযোগ আনতে এতো কষ্ট হয়।

সন্তানগুলোকে আগে জানাতে হবে কিভাবে আনন্দ নিয়ে শিখতে হয়। তাহলে তারা এমনিতেই মনোযোগী হয়ে উঠবে। আর পড়া-লেখা শেখার আগেও যে অনেক কিছু শেখার আছে সেটা সম্পর্কেও তাদের জানাতে হবে। আত্মনির্ভরশীল ও আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলাটাও যে পড়ালেখা শেখানোর মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এটাও বুঝতে হবে।

বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী আচারণগুলো পরিহার করা

এখান থেকে দেখে নিন, আপনাদের পরিবারে এই সমস্যাগুলো আছে কিনা? আজ থেকেই নিজেদেরকে পরিবর্তন করে ফেলুন। তাহলে আপনার আগামী দিনটি সুন্দর কাটবে।

(১) আপনারা স্বামী-স্ত্রী কি সন্তানদের সামনে ঝগড়া-ঝাটি করেন?

(২) আপনারা কি একে অপরকে রাগের মাথায় গালাগালি করা বা জিনিসপত্র ভাঙ্গেন?

(৩) আপনারা স্বামী-স্ত্রী কি সন্তানদের সামনে মিথ্যা কথা বলেন?

(৪) আপনারা কি একজন আরেক জনের বদনাম সন্তানদের নিকট বা অন্যের নিকট করেন?

(৫) আপনারা কি প্রতিবেশী বা আত্মীয়-স্বজনের গীবত করেন?

(৬) আপনারা কি অন্যের হক নষ্ট করেন?

(৭) আপনারা কি অবৈধ ইনকাম বা ব্যবসার সাথে জড়িত?

(৮) আপনারা কি টিভিতে আপত্তিকর মুভি বা অনুষ্ঠান দেখতে অভ্যস্ত?

(৯) আপনারা কি সন্তানদের সাথে দুর্ব্যবহার করেন বা গায়ে হাত তুলেন?

(১০) আপনারা সন্তানদেরকে দিয়ে কি মিথ্যা কথা বলান?

(১১) আপনারা সন্তানদের সামনে কি শশুর-শাশুড়ীকে নিয়ে বাজে মন্তব্য করেন?

(১২) আপনারা সন্তানদের সামনে কি সার্বক্ষণিক মোবাইল, ট্যব, ল্যাপটপ ইত্যাদি নিয়ে বসে থাকেন?

(১৩) আপনারা কি খাবার টেবিলে খাবার নিয়ে বাজে মন্তব্য করেন?

(১৪) আপনারা কি অপসংস্কৃতিগুলো বাসায় পালন করেন? এমন অনেক কাজ আপনাদের কারণে আপনাদের সন্তানের উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। যা সন্তান শুধু আপনার থেকেই শিখছে। সন্তানকে সুসন্তান হিসেবে গড়ে তুলতে হলে এ সব কাজ পরিহার করতে হবে।

মন্তব্য করার ক্ষেত্রে সংযমী হওয়া

অনেক মা-বাবাই সন্তানদের প্রতি নানা রকম মন্তব্য করেন। এতে ছেলে-মেয়েদের মন ছোট হয়ে যায়। তারা নিজেরা অপমানিতবোধ করে কষ্ট পায়। তাদের নানা অপারগতা, দুষ্টোমি ও বিভিন্ন রকমের ভুলের জন্য আমাদের উচিত সুন্দর করে বুঝিয়ে বলা। ধমক দিয়ে দূরে সরিয়ে না দেয়া। হঠাৎ তাদের কোন প্রশ্নে, কোন কাজে বা পরীক্ষার সম্ভাব্য নাম্বার

না পেলে আমরা এমন কিছু মন্তব্য করে বসি যা একদমই ঠিক নয়। এতে করে সন্তান এসব বাক্য নিজেরাও শিখে ফেলে এবং অন্যদের বলে বেড়ায়।

যুক্তরাষ্ট্রের চিলড্রেনস হসপিটাল অব উইসকনসিনের চিকিৎসক ডাক্তার কেনেথ এল গ্রিজেল তাঁর বৈজ্ঞানিক এক নিবন্ধে বলেন—'কৈশোরে মানসিক অশান্তির অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে মা-বাবার কোনো বিষয় নিয়ে 'ঘ্যানঘ্যান' করা। সন্তানের প্রতি মা-বাবার এমন আচরণে ৯০ শতাংশ কিশোর-কিশোরী তাদের কৈশোরে কোনো না কোনো সময়ে মানসিক অবসাদ আর হতাশায় ভোগে।

চৌদ্দ থেকে একুশ বছরের শতকরা ৭৬ ভাগ মানুষই মা-বাবার খুঁতখুঁতে আচরণের কারণে মা-বাবার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে। এই বিরক্তির কারণে ৮০ শতাংশ সন্তানই বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ে মাদকসহ বিভিন্ন অপরাধে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে।' যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব মেডিসিনের ইন্ডিয়ান জার্নাল অব সাইকিয়াট্রিতে এক তথ্যে বলা হয়েছে, প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে মানসিক অবসাদ আর হতাশার হার বেড়েই চলছে। ২০২০ সালের মধ্যে পৃথিবীতে মানসিক হতাশাগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা ৫ দশমিক ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

নিম্নে সাধারণ কিছু ভুল বাক্য দেয়া হলো, যা আমরা বলে থাকি এবং যা বলা থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিত;

১. তোকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না।

২. তুই একটা গাধা।

৩. তুই আস্ত একটা গর্দভ।

৪. তুমি একটা গরু/বলদ।

৫. তোর মাথা ভরা গোবর।

৬. তুই একটা ফালতু ছেলে/মেয়ে।

৭. তুই একটা অসভ্য।

৮. তুই একটা শয়তানের হাড্ডি।

৯. তোর চেয়ে অমুক অনেক ভালো।

১০. তুই না হইলেই ভালো হত।

১১. হওয়ার সময় মরে গেলে বাচতাম।

১২. তোর কারণে আমাদের জীবনটা শেষ।

এমন অনেক বাক্যই আমরা রাগ বশত সন্তানদের বলে থাকি। রাগ শয়তানের বড় একটা ফাঁদ।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

'প্রকৃতপক্ষে সে ব্যক্তিই শক্তিশালী, যে রাগের সময় নিজেকে সংবরণ করতে পারে।' [১]

যারা রাগ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আর আল্লাহ দয়াশীলদের ভালবাসেন। [২]

এসব থেকে অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যে, আমাদের এমন বাক্য থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখা উচিত।

মনোচিকিৎসক ও গবেষকরা সন্তানের সুস্থ মানসিক বিকাশের জন্য সচেতন মা-বাবা হিসেবে সন্তানকে নিজের মতো একটু সময় দিয়ে তাকে সহযোগিতার মনোভাব দেখানোর দিকে গুরুত্ব দেন। সুতরাং আপনার সন্তানের সমস্যা, দ্বিধা-অস্বস্তি আপনাকেই প্রথমে বুঝতে হবে। এ জন্য সন্তানের সঙ্গে যতটা সম্ভব বন্ধুসুলভ আচরণ করার চেষ্টা করুন। সন্তানের অসৎ দিক কিংবা ব্যর্থতার কথা সন্তানকে বারবার মনে করিয়ে কথা বলা থেকে বিরত থাকুন। এতে সন্তানের হতাশা আরো বেড়ে যায়। (সূত্রঃ ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, দ্য জাগল ও পাওনিয়ার উইমেন)

---

[১] সহিহ বুখারিঃ ৬৮০৯।
[২] সুরা আলে ইমরানঃ ১৩৪

চাইলেই সবকিছু পাওয়া যায় না

আপনার সন্তানকে 'অভাব' শেখান। আপনার প্রচুর সামর্থ্য থাকলেও আপনার সন্তানকে 'অভাব' শেখান। আপনি বাবা-এটিএম মেশিন না। আপনি মা-ঘষা দেয়া প্রদীপের দৈত্য নন। যে, সন্তান যখন যা চাইবে তা-ই উপস্থিত করবেন। সন্তান যা চাইবে তা-ই যদি দিয়ে দেন তাহলে আপনার সন্তানের 'মানুষ' হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। সন্তানকে জীবনের মানে বুঝানোর অর্থ কম ভালোবাসা না, বরং তাকে বেশী ভালোবাসা। কারণ আপনি যখন থাকবেন না, দুনিয়ার কঠিন পথে তাকে একা চলতে হবে। আপনার সন্তানকে এটা শেখান যে, 'চাইলেই সব কিছু পাওয়া যায় না'। সব কিছু পাওয়ার প্রয়োজনও নেই। কষ্টের মাধ্যমে অর্জিত জিনিসের মূল্য বোঝান। তাকে বোঝান সবকিছু ছাড়াও জীবন চলে। অভাবকে ভালোবাসতে হয়, তাতে অজ্ঞাতসারে স্বভাবটাও ভাল হয়।

হাতে কলমে কিভাবে শিখাতে হয়

একজন পিতার স্মৃতিচারণ

অর্থবিত্ত হওয়া সত্ত্বেও আমি আমার একমাত্র ছেলেকে কখনো দশ টাকার বেশি টিফিন খরচ দেইনি। সে বরাবরই তার বন্ধুদের দেখিয়ে বলে, 'বাবা দেখো আজ সে কতো ব্রাণ্ডেড দামি ঘড়িটা পড়ে এসেছে। বাবা দেখো, তার স্কুল ব্যাগটা আমদানিকৃত। সুন্দর না বাবা!

আমি শুধু মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দেই।

আমার ছেলের হুবহু ঐ জিনিসটা চাওয়ার কখনোই কিন্তু সাহস হয়নি। একদিন তার পায়ে সামান্য ব্যথা। স্কুল যাওয়ার সময় বললো, 'বাবা! আমাকে তোমার সাথে অফিসের গাড়িতে নিয়ে স্কুলে নামিয়ে দিবে?'

আমি তার সমস্যার কথা বিবেচনা করে বললাম, ঠিক আছে। এরপর প্রায় এক সপ্তাহ সে আমার সাথেই স্কুলে গেলো। 'আমি চুপচাপ তাকে নামিয়ে

দিতাম। এখন দেখছি আমার ছেলের হেঁটে যেতে ইচ্ছেই করছে না। পরেরদিন সকালে আমাকে বলার আগেই আমি বলে দিলাম, অফিসিয়াল জিনিস ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য নিষিদ্ধ। বাড়ি থেকে স্কুল দশ মিনিটের পথ। নির্দিষ্ট সময়ের কিছুক্ষণ আগে বের হবে। অনায়েসেই হেঁটে পৌঁছে যেতে পারবে। ছেলে আমার প্রচন্ড মন খারাপ করে বসে রইলো।

এদিকে আমার স্ত্রীও মন খারাপ করেছে। কেনো এমন করি! এর উত্তর জানা নেই।

আজ সন্ধ্যায় ছেলে আমার বাড়িতে এসেই বলেছে, 'জানো আমার বন্ধু শহরের সবচেয়ে সেরা স্কুলে ভর্তি হয়েছে। আমিও'

বাকিটুকু বলার আগেই আমি তাকে থামিয়ে জানতে চাইলাম বাবা! প্রতিষ্ঠান সেরা হয় নাকি ছাত্র? ধরো, আমি তোমায় সে স্কুলে দিলাম কিন্তু তুমি কোন বিষয়ে অকৃতকার্য হলে, তাহলে আমি কি বলবো, তুমি অকৃতকার্য নাকি স্কুল?

ছেলে বললো, 'বুঝেছি বাবা'।

আমি তার মাথায় হাত দিয়ে বললাম এই পর্যন্ত তোমার ক্লাসের কোনো ছেলেই তোমাকে পিছনে ফেলতে পারেনি। তুমিই ফার্স্ট বয়। সুতরাং তুমি যেখানে সেরাটা দিবে, সেই স্থানই তোমার মতো সেরা।

এরপর সে আর এরকম কোনো কথা বলেনি। '

আজ বিকেলে ছেলে বলছে, বাবা! আমার একজন অতিরিক্ত শিক্ষক প্রয়োজন। আমার গণিত ও ইংলিশে একটু সমস্যা হচ্ছে। আমি ছেলেকে বললাম, বাবা! একটু কষ্ট করতে হবে। আমি যখন রাত করে বাসায় ফিরবো। নয়'টা কিংবা দশটায় আমার কাছেই তোমাকে গণিত আর ইংলিশ পড়তে হবে। ছেলে বললো, বাবা! তুমি ক্লান্ত থাকো না?

আমি হেসে বললাম, না বাবা। আমার কাছে তোমাকে এক্সট্রা টিউটর দেয়ার এতো সামর্থ্য নেই। আমি বরং একটু কষ্ট করি। কি বলো?

ছেলে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, ঠিক আছে বাবা।

স্ত্রী রাতের বেলা জিজ্ঞাসা করলো, তুমি এরকম দশটা শিক্ষক রাখতে পারো কিন্তু!

কিন্তু আমি চাই আমার সন্তান বুঝুক আরাম করে কিছু পাওয়া যায় না। মানুষের জীবনে অভাব আসলে তা কিভাবে মোকাবেলা করতে হয় সেই পদ্ধতি সে শিখুক। কোনো কিছুই মন্দ নয় সে বুঝুক।

আমার স্ত্রী চুপ হয়ে গেলেন।

মাঝে-মধ্যে আমি আমার ছেলেকে নিয়ে ফুটপাতে হাঁটি। পথশিশু থেকে শুরু করে বিভিন্ন মানুষের সম্পর্কে জানাই। সে জানুক! পৃথিবী শুধু চিন্তায় সুন্দর। বাস্তবে খুবই কঠিন।

আমি চাওয়া মাত্রই তাকে কিছু দেইনি। একদিন সে বলেছিলো, বাবা! তুমি এরকম কেনো? তাকে বলেছিলাম, সময় হলে বুঝবে।

একবার বললো, সে ইলিশ পোলাও খাবে।

তাকে বললাম টাকাতো কম। তোমার কাছে কি কিছু আছে? থাকলে দাও। ইলিশ আনা যাবে। ছেলে আমার পঞ্চাশটি দশ টাকার নোট বের করে দিল। আমি অবাক হয়ে বললাম, তুমি খরচ করোনি?

সে মুচকি হাসি দিয়ে বললো, না বাবা। জমিয়েছি। আমার পরিচিত এক ভাই স্কুলে না খেয়েই আসে। তার কাছে কোনো টাকাও নেই। আসলে বাবা, সে খুব অসহায়। আমি যেদিন তাকে ক্ষুধার্ত দেখি, সেদিনই তার সাথে খাই। কারণ তখন সে না করে না। অন্যান্য দিনগুলোতে টাকা খরচ করি না। জমিয়ে রাখি, কারণ বাসা থেকে মা যা দেয় তা-ই যথেষ্ট। কারণ কিছু মানুষ তো সামান্যটুকুও পায় না।

আমি ছেলের দিকে অবাক নেত্রে তাকিয়ে আছি।

সেই গুছানো টাকা নিয়ে আরো কিছু টাকা মিলিয়ে ইলিশ এনে ছেলেকে

ইলিশ পোলাও খাওয়ালাম। আমি ইচ্ছে করেই তাকে অভাব অনুভব করাই। যেন সে বুঝতে পারে, জীবনটা কঠিন, অনেক কঠিন।

ঈদের বাজারে গিয়ে তাকে সাধ্যের মধ্যে ক্রয় করতে বললাম। সে একটা পাজামা নিয়েছে শুধু। জানতে চাইলাম, কি নিয়েছো? সে বলল, 'তোমার জন্য পাঞ্জাবি আর মায়ের জন্য শাড়ি নিয়েছি'। আমি হাসলাম।

সে বুঝতে শিখেছে টাকা কিভাবে খরচ করতে হয়।

একদিন সে আমাকে বলছে, বাবা! সায়েমটা আর মানুষ হলো না। অথচ আংকেল তার জন্য নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। সে যা চেয়েছে, তার সবটাই তাকে দিয়েছেন। আমি ছেলেকে বললাম, আমি কি তোমাকে কিছু দিতে পারিনি?

ছেলে আমার কোলে মাথা রেখে বললো, প্রতিটা চাহিদা পূরণ করে শিখিয়েছ অভাবে যেন স্বভাব নষ্ট না হয়। তুমি আমার জীবনে আমাকে যে শিক্ষা দিয়েছ বাবা, তা সব কিছুর উর্দ্ধে। তুমি শিখিয়েছ অভাবকে কিভাবে ভালবাসতে হয়। আমি এখনো জানি, আমি ছাড়া আমার বাবার কিছুই নেই। বাকিটা আমাকে করে নিতে হবে। আমি সাধারণ জামা-কাপড়েও হীনমন্যতায় ভুগি না। কারণ আমি জানি আমি কে!

তোমার দেয়া শিক্ষা আমি সারাজীবন ধরে রাখবো বাবা। চাওয়া মাত্রই পেয়ে গেলে আমি কখনো জানতামই না, পঞ্চাশ দিন না খেয়ে নাস্তার টাকা জমালে পাঁচশো টাকা জমা হয়। তুমি আছো বলেই সম্ভব। আমি মানুষকে মানুষের চোখে দেখি। আমি বুঝি জীবন কতটা কঠিন।

আমার স্ত্রী আজ বড্ড খুশি। সে আজ আমার উদ্দেশ্যটা বুঝতে পেরেছে। প্রায় দশ বছর পর ছেলে তার নিজ উপার্জনে ব্যক্তিগত গাড়ি কিনেছে। হাসতে হাসতে বলে বিগত পাঁচ বছরে নাস্তা আর বোনাসের টাকা জমিয়ে এটা কিনেছি।

বুঝতে পেরেছিলাম ছেলে আমার সঞ্চয়ী হয়েছে। সাথে সাথে মানুষও

হয়েছে। সপ্তাহখানিক পর আমার যাবতীয় সম্পত্তি তার নামে লিখে দিয়ে বললাম, সামলে রেখো। ছেলে জমির দলিল আমার হাতে দিয়ে বললো, তোমরা সাথে থেকো। আর কিছু লাগবে না।

আজ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আমার স্ত্রীকে বললাম, দেখেছো আমি ভুল করিনি। আমি আমার সন্তানকে মানুষ করতে গিয়ে জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাটাই দিয়েছি, যেমনটা আমার বাবা দিয়েছিলেন আমাকে। আমি অভাবে সন্তানকে লজ্জিত হওয়া নয় বরং দৃঢ় থাকতে শিখিয়েছি।

মা-বাবার প্রতি সুন্দর আচারণ সন্তানের মনে বিরাট প্রভাব ফেলে

সন্তানকে মা-বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করতে শিখানো। কারণ আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন—মা বাবার কোন কথা বা আচরণের বিপরীতে 'উফ' শব্দটাও উচ্চারণ করা যাবে না (ইসলাম বিরোধী হলে ভিন্ন কথা, কারণ আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষের আনুগত্য করার সুযোগ নেই)। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে মা-বাবাকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেলো কিন্তু তাদের খুশি করে। তাদের খিদমত করে জান্নাতে যেতে পারলো না, সে ধবংস হয়ে যাক। এই কথাগুলো দিয়ে আমরা কি বুঝি?

মা-বাবা একসময় আমাদেরকে লালন পালন করেছেন। এরপর যখন তারা বয়স্ক হয়ে যান তখন তাদেরকে লালন পালন করা সন্তানের দায়িত্ব। এটাই আল্লাহ ও তার রাসুল বলেছেন। যেভাবে আমরা ছোট থাকতে তারা আমাদের পক্ষ থেকে শত কষ্ট সহ্য করেছেন, এখন আমাদের দায়িত্ব হলো তাদের পক্ষ থেকে কোন কষ্টদায়ক আচরণ হলে সেটা সহ্য করা।

এবার বাস্তব জীবনের কথা বলি। মানুষ যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় তখন সত্যি সত্যিই তারা শিশুর মত হয়ে যায়। শিশুরা যেমন অল্পতে রাগ করে

ফেলে, সেও তেমন অল্পতেই রেগে যায়। শিশুর যেমন চকলেট, আইসক্রিম খেতে মনে চায়, বৃদ্ধ মানুষেরও শিশুদের মত হঠাৎ এই ধরণের শিশুদের খাবার খেতে মনে চায়।

পার্থক্য হলো, শিশুরা বলতে পারে বা বলে, কিন্তু বৃদ্ধরা মনে চেপে রাখে, বলে না। আমার এক শিক্ষক ছিলেন। বয়স ৭০ এর কম হবে না। তিনি বলেছিলেন, বাবা—মায়ের জন্য আইসক্রিম, চকলেট, ডাব ইত্যাদি কিনে নিয়ে যাবেন। তাদেরকে খাওয়াবেন। তারা এগুলো কিনতে বলবে না। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এই বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়ে নিজের কথা বলছি, আমাদের অনেক কিছু খেতে মনে চায়। যেমন সন্তানরা খেতে চায়। কিন্তু ছেলে মেয়েদেরকে বলতে লজ্জা লাগে। আমরা নিজের সন্তান লালন-পালন ভালো বুঝি। কিন্তু বাবা—মা'কেও যে সন্তানের মত লালন পালন করতে হয়, তাদের খেদমত করতে হয়, তাদের কষ্টদায়ক আচরণ সহ্য করতে হয়, তাদের জন্য বিভিন্ন খাবার কিনে নিয়ে যেতে হয়, এগুলো বুঝি না। অথচ আল্লাহ ও তার রাসুল এই সেবা-শুশ্রূষাকে জরুরী বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, বাবা-মা'কে শুশ্রূষাকে করার ক্ষেত্রে অবহেলা করলে দুনিয়াতেই শাস্তি দেয়া হবে।

বুখারী শরিফে বর্ণিত হয়েছে, সবচেয়ে দ্রুত শাস্তি আনয়নকারী পাপ হলো মা-বাবাকে কষ্ট দেয়া। দুনিয়াতেই নগদ ভালো ফল লাভের আমল হলো মা-বাবার সেবা করে তাদেরকে খুশি করা।

অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো; আমি যা করবো তা-ই ফেরত পাবো। সুতরাং বাবা মায়ের সাথে আমার আচরণ যদি সুন্দর হয়, তাহলে আমার সন্তানের আচরণ আমার সাথে ভালো হবে। এই কথাটা ধ্রুব সত্য। তাহলে ব্যাপারটা এই দাঁড়ালো যে, সফলভাবে আমার নিজের সন্তানের লালন পালনের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হলো উত্তমরূপে বাবা-মা কে লালন পালন। এর দ্বারা আমি যেমন উপকৃত হবো আমার সন্তানও ঠিক তেমনি উপকৃত হবে। তার ইহকাল ও পরকাল উভয়টাই শান্তিময় হবে।

ইলমের পিপাসা ও পরিচর্যা

মুফতি ফয়যুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহু-এর দুই মেয়ে

মুফতিয়ে আযম মাওলানা মুফতি ফয়যুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহু-এর উরসে কয়েকজন কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। তন্মধ্যে দুই মেয়ে বেঁচে ছিল। বড় মেয়ের নাম রাহিমা খাতুন। ছোট মেয়ের নাম যায়নাব খাতুন। তাঁরা আশ্চর্য প্রতিভার অধিকারিনী ছিলেন। তাদের ইলম অর্জনের আগ্রহের কথা শুনলে অবাক হতে হয়। অতি অল্প বয়সেই তারা যেসমস্ত কিতাব পড়ে ফেলেছিলেন, শুনলে অবাস্তব মনে হয়।

পিতা নিজেই তাঁদের অনেক প্রশংসা করতেন। বড় মেয়ে সম্পর্কে বলেন, আমার কলিজার টুকরা মেয়েটি যদি পুরুষ হত, মাশাআল্লাহ অনেক বড় আলেম হত। কিংবা বিবাহটাও যদি কিছু দেরিতে হত, তাহলে ফাযেলা বনে যেত। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ফায়সালা। চৌদ্দ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই তার বিবাহ হয়ে গেল এবং সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এভাবে বিভিন্ন সময় উভয় মেয়ের কথা বলতেন।

বড় মেয়ে সম্পর্কে মুফতি সাহেব নিজেই বলেন, তার মেধা শক্তি এবং কিতাবাদী বুঝা ও মুখস্ত করার যোগ্যতা ছিল প্রখর। অত্যন্ত বুঝমান এবং মেধাবী ছিল। কিতাবের যত কঠিন বিষয় হোক; অত্যন্ত পরিপূর্ণতার সাথে উপস্থাপন করতে পারতো। ইবারাতের স্বাভাবিক অর্থ সঠিকভাবে বুঝতে পারত। সবক শুনাতে অথবা সামনের পড়া পড়তে ইবারত (আরবী পাঠ) খুব দ্রুততার সাথে পড়তে পারত। নির্ভুল পড়ত। হস্তাক্ষর ছিল পরিষ্কার ও সুন্দর। যে কোনো বিষয় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে সামগ্রিকভাবে তুলে ধরতে পারত।

মুফতিয়ে আযম রাহিমাহুল্লাহু বলেন, 'অনেক সময় আমি তাকে দিয়ে ফতওয়াও নকল করিয়েছি। ফারায়েয ও ('মিরাছ বন্টন-হিসাব) করিয়েছি। মাশাআল্লাহ ফারায়েযে সে খুবই দক্ষ ছিল'।

মুহতারামা রহিমা খাতুন, তার নিজের শিক্ষা-দীক্ষার বিষয়ে বলেন, আমাদেরকে পড়ানোর ক্ষেত্রে আব্বাজান রাহিমাহুল্লাহু-এর সীমাহীন আগ্রহ ছিল। আল্লাহ তাআলার অসীম মেহেরবানী তিনি আমাদেরকেও দ্বীনী ইলম অর্জন করার সীমাহীন আগ্রহ দান করেছেন। আব্বাজান রাহিমাহুল্লাহু আমাদেরকে যত্নের সাথে পড়াতেন। আমি আর আমার ছোট বোন যায়নাব এবং ঘরের অন্যান্য সন্তানদেরকে পড়ানোর জন্য উস্তাযে মুহতারাম মাওলানা আযীযুল্লাহ সাহেব রাহিমাহুল্লাহু-কে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আমি দশ বছর বয়সেই সম্মানিত উস্তাযের কাছে উর্দু-ফার্সীর প্রাথমিক কিতাবগুলো এবং ইলমে ছরফের মিযান-মুনশাইব, পাঞ্জেগাঞ্জ এবং ইলমে নাহুর নাহবেমীর পরিপূর্ণরূপে শিখে ফেললাম। তিনি আরো বলেন, আমি এই কিতাবগুলো যতটুকু পড়েছি যায়নাবও আমার চেয়ে ছোট হওয়া সত্ত্বেও উস্তাদজীর কাছে ততটুকু পড়েছে। তবে যায়নাব ইলমে ছরফে অনেক পাকা ছিল। কোনো ছীগা জিজ্ঞাসা করলে সাথে সাথে বলে দিতে পারত। যায়নাবের দক্ষতা সম্পর্কে আব্বাজান রাহিমাহুল্লাহু বলেন, একবার আমার দোস্ত মুহতারাম মাওলানা আব্দুল মাজিদ শাহ সাহেব রাহিমাহুল্লাহু এবং মাওলানা আবুল হাসান রাহিমাহুল্লাহু ও মাওলানা নূর আহমদ সাহেব রাহিমাহুল্লাহু আমাদের ঘরে এলেন। খানাপিনা থেকে ফারেগ হওয়ার পর যায়নাবকে আমার রচিত 'তালীমুল মুবতাদী' থেকে কিছু প্রশ্ন করলেন। যায়নাবের বয়স ছিল তখন খুবই কম। কিন্তু মাশাআল্লাহ সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিল। তখন শাহ সাহেব রাহিমাহুল্লাহু খুব খুশি হলেন এবং তাকে পুরস্কার দিলেন।

মুফতিয়ে আযম রাহিমাহুল্লাহু বলেন—'তালীমুল মুবতাদী' রচনা করার প্রেক্ষাপট ছিল; আদরের কন্যা যায়নাবের আরবী সাহিত্যের সাথে সম্পর্ক তৈরি করানোর জন্য কিছু জুমলা আরবীতে লিখিয়ে দিতাম। এভাবে কিছু লেখা একত্রিত হয়ে একটা কিতাবের আকার ধারণ করে।

মুহতারামা রহিমা খাতুন আরো বলেন, দশ বছর বয়সেই নাহবেমীর পর্যন্ত পড়ার পর পড়াশোনার আগ্রহ আরো বাড়তে থাকল। আব্বাজান

রাহিমাহুল্লাহু-এর ইচ্ছাও এটাই ছিল যে, উস্তাদজীর কাছে প্রচলিত সমস্ত কিতাবই পড়ব। পরে যখন উস্তাদজীর কাছে যেতে লজ্জাবোধ করতে শুরু করলাম তখন আব্বাজান নিজেই ঘরের মধ্যে খুব গুরুত্বের সাথে পড়ানো শুরু করলেন। ফজর এবং জোহর নামাযের পরে এবং রাতে পড়াতেন। উস্তাদজীর কাছে পড়া কিতাবগুলো ছাড়াও আব্বাজান প্রথমেই কারিমা, পান্দেনামা আত্তার, গুলিস্তা, বোস্তা এবং ফার্সী কিতাবগুলোর পাশাপাশি আরবী মুফীদুত তালেবীন, তালীমুল মুতাআল্লিম, কালয়ূবী, কাসীদাহ বুরদাহ, নাফহাতুল আরব এবং আল্লামা ইবনু তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহু-এর প্রসিদ্ধ কিতাব আলফুরকান ইত্যাদি পড়ালেন। ফিকহের মধ্যে মালাবুদ্দামিনহু, কুদুরী এবং আব্বাজান রাহিমাহুল্লাহু-এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ আরবী ও ফার্সি কিতাবও পড়ালেন। আমার বয়স যখন তের বছর তখন আব্বাজান রাহিমাহুল্লাহু আমাকে উলূমে আরাবিয়্যাহ এবং ফিকহের সাথে সম্পর্ক তৈরি করানোর জন্য হেদায়া পড়াতে শুরু করলেন। আব্বাজান রাহিমাহুল্লাহু হেদায়া শুরু করার পর আমি অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দের সাথে পড়তে লাগলাম। হেদায়ার পাশাপাশি আরো দু-তিনটি বিষয়ের দু'তিন কিতাবও পড়লাম।

আলহামদুলিল্লাহ, আমি রাত-দিন মুতালাআয় ডুবে থাকতাম। আমার পড়াশোনার জন্য আলাদা একটা কামরা ছিল। পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটবে বিধায় আম্মার সাথে থাকার পরিবর্তে ঐ কামরায় থাকতাম এবং রাতেও সেখানে থাকতাম।

কোনো কোনো সময় এমন হতো যে, যথেষ্ট পরিমাণ রাত জাগার পর আব্বাজান রাহিমাহুল্লাহু এসে শুয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিতেন। আব্বাজানের কথা অনুযায়ী বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়তাম। কখনো আবার এই কৌশল অবলম্বন করতাম যে, 'হারিকেনের চিমনী কাগজ দিয়ে ঢেকে দিতাম' যেন তিনি মনে করেন আমি শুয়ে পড়েছি। মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহু একবার হাটহাজারীর জামে মাসজিদে তাঁর বুধবারের বয়ানে বলেন, যেদিন মেয়ে রহিমা খাতুন তাফসিরে জালালাইন শুরু করল ঐদিনের

কথা, আমি রাতের যথেষ্ট অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর কোনো প্রয়োজনে ঘুম থেকে জাগ্রত হলাম। দেখতে পেলাম রহিমার ঘরে বাতি জ্বলছে। এত রাতে তার ঘরে আলো দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। চুপি চুপি তার কামরার কাছে গেলাম। দেখলাম, সে জালালাইন শরিফের মুতালাআয় ডুবে আছে। এটা দেখে আমার আর খুশীর সীমা রইল না। আমি আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করলাম।

বড় মেয়ে রহিমা খাতুন বলেন, হেদায়া শুরু করার পর নিয়মিত পড়তে থাকলাম এবং অল্প দিনেই হেদায়ার প্রথম দু'খণ্ড শেষ হয়ে গেল। তখন আব্বাজান রাহিমাহুল্লাহু আবার পড়াতে শুরু করলেন। পাশাপাশি মিশকাত শরিফ-এরও ছবক দিলেন। মিশকাত শরিফ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শব্দে শব্দে পড়ালেন এবং শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহিমাহুল্লাহু রচিত أشعة اللمعات (মিশকাত শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ) পূর্ণ চার খণ্ড সমাপ্ত করালেন।

মিশকাত শরিফ أشعة اللمعات -সহ যখন সমাপ্ত হল তখন আমার চৌদ্দ বছর পূর্ণ হল। আবার যখন মিশকাত শরিফ পুনরায় পড়তে শুরু করলাম তখন হেদায়া আখেরাইন (৩য় ও ৪র্থ খণ্ড) এবং জালালাইন শরিফ সবক দিলেন। আর তখনই আমার বিবাহ হয়ে গেল।

আলহামদু লিল্লাহ বিবাহের পূর্বেই এ সমস্ত কিতাবাদি পরিপূর্ণভাবে শেষ হয়ে গেল।

তিনি আরো বলেন, ইলম অর্জনের যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল বিবাহের পর তাতে ভাটা পড়ল। কুতুবে সিত্তা (ছিহাহ ছিত্তা) খতম করার যে তামান্না অন্তরে ছিল সেটাও পূর্ণ হল না। এজন্য যদি জীবনের শেষ পর্যন্তও আফসোস করি তা কমই হবে।

এখন শুধু কবির এ কথায় সান্তনা খুঁজি;

> *'মানুষ যা কামনা করে তার সবটাই সে পায় না। আর কখনো বাতাস জাহাজের বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়'।*

অবশ্য বিবাহের পরে মুয়াত্তা মুহাম্মাদ এবং সিরাজী পড়েছি।

মুফতিয়ে আযম রাহিমাহুল্লাহু বলেন, রহিমার ফারায়েযের ক্ষেত্রে অনেক দক্ষতা ছিল। বিবাহের পরে ঘরের ঝামেলা এবং বিভিন্ন সমস্যার কারণে নিবিড়ভাবে পড়াশোনার সুযোগ সে পায়নি। এর মাঝেই যতটুকু সম্ভব হয়েছে চেষ্টা চালিয়ে গেছে।

মুহতারামা রহিমা খাতুন আরো বলেন, ছোট বোন যায়নাব উস্তাযে মুহতারাম মাওলানা আযিযুল্লাহ সাহেবের কাছে নাহবেমীর পর্যন্ত পড়ার পর আব্বাজান রাহিমাহুল্লাহু 'তালীমুল মুবতাদী', 'ফয়যুল কালাম' 'হিদায়াতুল ইবাদ' ইত্যাদি কিতাব পড়ালেন। ইন্তেকালের আট/নয় বছর পূর্বে আব্বাজান রাহিমাহুল্লাহু আমাদের দু'বোনকে কুরআনের তরজমা জরুরি তাফসিরসহ পড়িয়ে দিলেন। আমার তো কিছু কারণে কখনো কখনো অনুপস্থিতি হয়ে যেত। কিন্তু ছোট বোন যায়নাব ঠিকই আব্বাজানের কুরআনের দরস দ্বারা উপকৃত হতে থাকল। আব্বাজান রাহিমাহুল্লাহু আমাদেরকে যে পরিমাণ ভালবাসতেন, তা প্রকাশ করার ভাষা আমাদের নেই। আম্মাজান রাহিমাহুল্লাহু বলেন, আমি যখন খুব ছোট ছিলাম আব্বাজান রাহিমাহুল্লাহু কোথাও গেলে ঘরে এসে প্রথমেই আমাকে কোলে নিতেন। আমাদের খোঁজখবর নিতেন। আর সবচেয়ে বড় ভালবাসা হল তিনি আমাদেরকে ইলমে দ্বীন শিখিয়েছেন। যার শুকর আদায় করে শেষ করতে পারব না।

আখলাক-চরিত্র: বড় মেয়ের চরিত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এক দৃষ্টান্তহীন নারী ছিলেন তিনি। তার স্বভাব-চরিত্র ছিল প্রশংসার যোগ্য। আল্লাহ তাআলা মুফতিয়ে আযম রাহিমাহুল্লাহু-কে যে সমস্ত বিরল গুণ এবং নমুনাহীন চরিত্র দান করেছেন তার সবটাই তিনি পেয়েছিলেন। আচার আচরণ, চলা-ফেরা, অভ্যাস-রীতি মোটকথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে সম্মানিত পিতার অবিকল প্রতিচ্ছবি ছিলেন।

ছোট মেয়ে যায়নাব সম্পর্কে জীবনীকার বলেন, তিনি আমার খালা-শাশুড়ি ছিলেন। সাত বছর আমি তাদের বাড়িতে রাত-দিন অবস্থান

করেছি। এই দীর্ঘ সময়ে তাঁর গলার আওয়াজ কখনো আমার কানে আসেনি। অথচ মাঝখানে শুধু বাঁশের বেড়া ছিল।

তার লজ্জা এতই প্রবল ছিল। এগার বছর পর্যন্ত তার সাথে আমার একটি কথাও হয়নি। কয়েক বছর আগে হযরতের জীবনের কিছু তথ্য সংগ্রহ করার জন্য তার বড়বোনের মাধ্যমে অনেক পীড়াপীড়ি করলাম। নিজের পিতার কিছু কথা আমাদেরকে শুনান, কিন্তু লজ্জার দরুণ তার মুখ থেকে এক শব্দও বের হয়নি।

শুধু মেয়েদের ক্ষেত্রেই নয়, মুফতি সাহেব স্বীয় স্ত্রীর পড়াশোনার ক্ষেত্রেও বেশ সজাগ ছিলেন। এ বিষয়ে খুব গুরুত্ব দিতেন। স্ত্রীর তালীমি বিষয়ে রাহিমাহুল্লাহু নিজেই বলেন, তিনি যখন খুবই ছোট তখন আমি মকতবে কিছু সন্তানদের পড়াতাম। তার মধ্যে আমার আহলিয়াও ছিল। বিবাহের আগে কায়েদা থেকে কুরআন শরিফ পর্যন্ত শিক্ষা দিয়েছি।

অবশ্য বিবাহের পরে উর্দু কিতাব যেমন, রাহে নাজাত, যীনাতুন নিসা, হুকুকুল ইসলাম, মিফতাহুল জান্নাত, বেহেশতী জেওর (এগার খণ্ড) এবং ফার্সী পহলী ইত্যাদি কিতাবগুলো পড়িয়েছি। আরবীর সাথে সম্পর্ক তৈরি করানোর জন্যে 'মুফীদুত তালেবীন' শুরু করেছি, কিন্তু ঘরোয়া বিভিন্ন ঝামেলা ও বিভিন্ন অসুস্থতার কারণে আর সম্ভব হয়ে উঠেনি। অন্যথায় ইচ্ছা ছিল মেয়েদের মত একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পড়াব। তারপর মাদরাসার দরসের ফাঁকে ফাঁকে কিছু পড়াতাম।

এসবকিছু লেখার উদ্দেশ্য এই নয় যে, আমরা একজন আরেকজনের কাছে বলব আর তৃপ্তি পাব। বরং উদ্দেশ্য হলো, উপদেশ গ্রহণ করা এবং তাঁদের উত্তম অবস্থাগুলো নিজের চলার পথের মশাল বানানো। মুফতি রাহিমাহুল্লাহু-এর পরিবারস্থ নারীরা আমাদের জন্য আদর্শ ও নারী জাতির মাঝে অনন্য দৃষ্টান্ত। তিনি তাদেরকে আরবী, ফার্সী, উর্দু, কুরআনের তাফসির, ফিকহ কোনোটাই শিক্ষা দিতে বাদ রাখেননি।

নারী জাতির কত ঝামেলা-অজুহাত, একটু চিন্তা করি; তারাও তো

আমাদের মতই নারী। অত কম বয়সে এতগুলো কিতাব পড়ে ফেলা খুব বেশি আগের কথাও নয়। তারা তো আমাদের দেশেরই নারী। আজ আমাদের মাঝে দ্বীন শিক্ষার আগ্রহ খুবই কম। সাংসারিক ঝামেলায় পড়ে গেলে তো আর কথাই নেই। যদি একটু ভেবে দেখি তাহলে তাঁদের জীবন কাহিনীতে যথেষ্ট চিন্তার খোরাক রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে একটু ভেবে দেখার তাওফিক দান করুন। আমিন।

সন্তান পরীক্ষায় ভালো না করলে মন খারাপ না করা

১. আমাদের এক বন্ধু এসএসসিতে খারাপ রেজাল্ট করে। পরবর্তীতে সে ট্রেনে করে দেশান্তরি হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তার এ সিদ্ধান্তের মূল কারণ হলো, মারধরে ভয় অথবা মানুষের অপমান বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা। বন্ধুটি এখন ইউরোপের একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ায়। আমি যখন তার ডিসিপ্লিনের কাউকে বলি, অধ্যাপক অমুকের সাথে আমার পরিচয় আছে, তখন শ্রোতার চোখ সরু হয়ে যায়। খুব একটা বিশ্বাস করতে চান না।

২. আজকে আপনার যে সন্তানটি খারাপ করেছে, সে সারা জীবনই খারাপ করবে এটা কেউ দেয়ালে লিখে দেয়নি। অলিম্পিকে দেখবেন একশো মিটার স্প্রিন্টে যে প্রথম দৌঁড়ানো শুরু করে, সে সব সময় প্রথম হয় না। একটু পর শুরু করেও অন্য কেউ প্রথম হয়। আপনার সোনামণিও জীবনের কোনো স্প্রিন্টে হয়তো দৌড়টা ভালোভাবে শুরু করতে পারেনি। তার মানে শেষটা যে তার ভালো হবে না তা নয়।

৩ ইংরেজিতে 'ফলস স্টার্ট' (False Start) এবং 'গুড স্টার্ট' (Good Start) বলে একটি কথা আছে। ফলস স্টার্ট হলো ভুল ভাবে শুরু করা। আজ যে ছেলে-মেয়ের শুরু হয়েছে ভুলভাবে, একটু উৎসাহ পেলে তার পুরো জীবনটাই হবে গুড স্টার্টে ভরা।

৪. তার সবচে বেশি দরকার উৎসাহ। সহানুভূতি। মায়া। এ তিনের

সমন্বয় তাকে বদলে দেবো। আমার পরিচিত এক বিশ্ববিখ্যাত মানুষ মাদকাসক্ত ছিলেন। চুরিচামারি করতেন। শেষ পর্যন্ত এ কারণে তাঁকে জেলে যেতে হয়েছিল। সেখানেই এক বৃদ্ধ কারারক্ষী তাঁকে বলেছিল, আমি জানি তুমি পারবে। তোমার চোখে আগুন আছে। সে ছেলেটি এখন চুয়াল্লিশটি কোম্পানির মালিক! ঋণখেলাপী মালিক নয়। ইউরোপে এ সুযোগ নেই। আপনার সন্তানের চোখেও আগুন আছে। সেটা জ্বালিয়ে দিন। অপমানের জলে দয়া করে তা নিভিয়ে দেবেন না।

৫. একটি পরীক্ষায় খারাপ করা মানে জীবন ধ্বংস নয়। আপনার দৃষ্টিতে সফল এমন দশজন মানুষের সাথে কথা বলুন, দেখবেন কমপক্ষে আটজন জীবনের সব পরীক্ষায় ভালো করেননি। আজই পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

৬. সন্তানের মুখ ভয়, হতাশা আর অপমানে নীল হয়ে আছে? তার মাথায় হাত রাখুন, বলুন, 'মার্কশীট যাই বলুক, আমি জানি তুমি কী?' দেখবেন এক সময় মার্কশীটও বলতে থাকবে আসলে সে কে?

৭. সন্তানকে বলুন, 'চাবির এক মোচড়ে বেশিরভাগ সময় তালাও খুলে না। ঠিক তেমন তোমার একটি মোচড় হয়তো ভালো হয়নি। তাতে কিছু আসে যায় না। আবার মোচড় দাও। ভেবেচিন্তে দাও। তালা খুলবে। দেখবে বন্ধ দরজার ওপারে অন্য পৃথিবী। সে পৃথিবী আনন্দের। সে পৃথিবী সাফল্যের।'

৮. দয়া করে মনে রাখবেন, দেশালয়ের কাঠি প্রথমবার না জ্বললেও পরের বার জ্বলে। শুধু তাতে বারুদ থাকতে হবে। আপনার সন্তানের মধ্যেও এ বারুদ আছে। শুধু তা তাকে দেখিয়ে দেয়ার পালা।

৯. তাকে বলবেন, আইনস্টাইনও জুরিখ পলিটেকনিক ইনিস্টিউটে প্রথম ভর্তি পরীক্ষায় 'ডাব্বা' মেরেছিলেন। কিন্তু দিন শেষে তিনি 'আইনস্টাইন' হয়েছিলেন। অতএব ভয় নেই। হতাশ হওয়ার মতো কিছু ঘটেনি।

১০. শেষ যে কথাটি সন্তানকে বলবেন তাহলো, ওপরের সব কথাইরই

ফলন গঠবে যদি সে চেষ্টা করে। সব কথাই ফলানোর ক্ষমতা তার আছে, যদি সে লেগে থাকে।

আর শেষ যে কাজটি আপনাকে করতে হবে তাহলো, মজবুত একজোড়া জুতো পায়ে দিতে হবে। কেন? তার মোবাইলটি হাতে নিন। তারপর সেই মজবুত জুতোর নিচে পিষে তা গুড়োগুড়ো করে দিন। টাকা নষ্ট হবে? হোক। মাঝে মাঝে টাকাকেও পায়ে দলতে হয়। মোবাইলের চেয়ে বড় শত্রু আপনার সন্তানের আর কেউ নেই।[৩]

বিভিন্ন বিভাগে সন্তানের শ্রেষ্ঠত্ব

১.সন্তান পিতা-মাতার চক্ষু শীতলতা।

২. সন্তান ঘর ও পরিবারের জন্য শোভা।

৩. বংশীয় সূত্রে সে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি।

৪. সন্তান জান্নাতের ফুল।

৫. সন্তান পার্থিব জীবনের সজ্জা।

৬. সন্তান ভূপৃষ্ঠের এক অমূল্য সম্পাদ।

৭. সন্তান বাল্যকালে পাড়া-মহল্লার জন্য শোভা।

৮. সন্তান বিদ্যালয়ের ভূষণ।

৯. সন্তান আল্লাহ প্রদত্ত অমূল্য উপহার।

১০. সন্তান ঘর ও পরিবারের সুখের আড়াল।

১১. সন্তান সমাজ, রাষ্ট্র ও মানবতার জন্য বাতিঘর।

১২. সন্তানের থেকে এত বড় নেয়ামত আল্লাহ আর কিছু দান করেননি।

১৩. সন্তান স্বভাবজাত সবার কাছেই বেশি প্রিয় ও পছন্দনীয় হয়।

১৪. সন্তান আপাদ মস্তক আল্লাহ তাআলার নেয়ামত।

---

[৩] লেখাঃ বাদল সৈয়দ।

১৫. নেক সন্তান দুনিয়া ও আখেরাতে গর্বের কারণ হবে।

১৬. সন্তান পিতা-মাতার কলিজার টুকরা। যেমনটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছেন।

১৭. নেক সন্তান পিতা-মাতার জন্য প্রতিদান লাভের মাধ্যম।

১৮. সন্তানের সারা জীবনের প্রতিটি নিঃশ্বাস পিতা-মাতার জন্য প্রতিদান হবে।

১৯. বংশগত বৈশিষ্ট্য ও তার সম্মান-মর্যাদার পূর্ণ সংরক্ষক।

২০. সন্তানের কুরআন পড়া, শেখা পিতা-মাতার মুক্তি লাভের অন্যতম মাধ্যম।

২১. নেক সন্তান উত্তম সাদকায়ে জারিয়া।

২২. সন্তানের দু'আ আখেরাতে পিতা-মাতার উন্নতির কারণ হবে।

২৩. যেই ব্যক্তি তার ছোট সন্তানের হৃদয় খুশি করবে আল্লাহ তাআলাও তার হৃদয় খুশি করে দিবেন।

লোকমান হাকিমের উপদেশ

১। প্রিয় বৎস! কর্জ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবে। কেননা তা দিনের বেলায় অপমান এবং রাত্রিতে দুশ্চিন্তার কারণ হয়।

২। প্রিয় বৎস! তুমি মোরগের চেয়ে বেশী অক্ষম হয়ো না। সেও তো শেষ রাতে জেগে উঠে চিৎকার শুরু করে। অথচ তুমি নিজ বিছানায় ঘুমে বিভোর থাকো।

৩। বেটা! গুরুত্ব দিয়ে জানাযায় অংশগ্রহণ হবে। অহেতুক অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকবে।

৪। হে বৎস! আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্য অবলম্বন করবে।

৫। অন্যকে উপদেশ দেয়ার আগে নিজে আমল করার চেষ্টা করবে।

৬। নিজের মান-মর্যাদা বজায় রেখে কথা বলবে।

৭। ভাল মানুষরূপে বিবেচিত হওয়ার চেষ্টা করবে।

৮। স্বীয় অধিকারের প্রতি সচেতন থাকবে।

৯। গোপন তথ্য কারো নিকট প্রকাশ করবে না।

১০। বিপদে বন্ধুর পরীক্ষা নিবে।

১১। বন্ধুদের ভালোমন্দ উভয়টাই পরীক্ষা করবে।

১২। বিচক্ষণ এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্ব গড়বে।

১৩। ভালকাজে পুণঃপুণঃ অংশগ্রহণ করবে।

১৪। নিজের কথা প্রমাণ করে দিবে।

১৫। বন্ধুদেরকে নিজ সাধ্যমত ভালবাসবে।

১৬। শত্রু বা মিত্র সকলের সাথেই হাসিমুখে সাক্ষাৎ করবে।

১৭। পিতা-মাতাকে সর্বাধিক সম্মান করবে।

১৮। শিষ্যকে সর্বাধিক মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখবে।

১৯। আয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে ব্যয় করবে। এবং প্রত্যেক কাজে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে।

২০। কথা বলার সময় মুখ আয়ত্বের রাখবে।

২১। বীরত্বকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করবে।

২২। শরীর এবং পোষাক পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে।

২৩। ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকবে।

২৪। প্রচলিত অস্ত্র-সস্ত্র ও যানবাহন পরিচালনা শিখে নিবে।

২৫। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদান করবে।

২৬। রাতের বেলায় যদি কথা বলার প্রয়োজন হয় তাহলে আস্তে এবং নরম স্বরে কথা বলবে।

২৭। দিনের বেলায় কথা বলার সময় চতুর্দিকে লক্ষ্য রেখে কথা বলবে।

২৮। কম কথা বলা, কম খাওয়া এবং কম ঘুমানোর অভ্যাস করবে।

২৯। নিজের জন্য যা পছন্দ করো না, তা অন্যের জন্য পছন্দ করবে না।

৩০। বিচক্ষণতা ও কৌশল অবলম্বন করে কাজ করবে।

৩১। উপযুক্ত শিক্ষিত না হয়ে অন্যকে শিখাতে যেও না।

৩২। অন্যের ধনসম্পদের প্রতি লক্ষ্য করবে না।

৩৩। নীতিহীনদের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা আশা করবে না।

৩৪। কোনো কাজেই চিন্তামুক্ত হবে না।

৩৫। যে কাজ তুমি করনি, এরূপ কাজ করেছ বলে মনে করবে না।

৩৬। আজকের কাজ আগামীকালের জন্য রেখে দিবে না।

৩৭। বড়দের সাথে হাসিঠাট্টা করতে যেও না।

৩৮। আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে অংশিদার সাব্যস্ত করো না।

৩৯। তোমার প্রতি যারা আশা রাখে, তাদেরকে নিরাশ করো না।

৪০। বড়দের সামনে কথা দীর্ঘায়িত করবে না।

৪১। অতীতের তিক্ততা মনে রেখো না।

৪২। নিজের ধন সম্পদের কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করবে না।

৪৩। সৎ লোকদের নিন্দা করবে না।

৪৪। আপনজনদের কাছ থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হয়ো না।

৪৫। অহংকার করবে না।

৪৬। মানুষের সামনে দাঁত খেলাল করবে না।

৪৭। মানুষের সামনে মুখে বা নাকে অঙ্গুল প্রবেশ করাবে না।

৪৮। শব্দ করে থুথু ফেলবে না।

৪৯। হাই তোলার সময় মুখে হাত রাখবে।

৫০। কাউকে জনসম্মুখে লজ্জা দিবে না।

৫১। চোখ দ্বারা ইশারা করবে না।

৫২। এক কথা বারবার বলবে না।

৫৩। তামাশামূলক অবাস্তব কথা বলবে না।

৫৪। ঠাট্টা-বিদ্রুপ থেকে বিরত থাকবে।

৫৫। অন্যের সামনে নিজের প্রশংসা করবে না।

৫৬। মেয়েদের ন্যায় সাজসজ্জা করবে না।

৫৭। কথা বলার সময় হাত নাড়াচাড়া করবে না।

৫৮। আপনজনদের শত্রুর সাথে উঠাবসা করবে না।

৫৯। কারো মৃত্যুর পর তার সম্পর্কে অসৎ মন্তব্য করবে না।

৬০। যথাসম্ভব ঝগড়া বিবাদ থেকে বিরত থাকবে।

৬১। সৎলোকের প্রতি সুধারণা রাখবে।

৬২। নিজের খানা অন্যের দস্তরখানায় নিয়ে যাবে না।

৬৩। কোনো কাজেই তাড়াহুড়া করবে না।

৬৪। পার্থিব স্বার্থের মোহে নিজেকে দুঃখ-কষ্টে ফেলবে না।

৬৫। রাগান্বিত অবস্থাতেও ধীর ও শান্তভাবে কথা বলবে।

৬৬। জামার হাতা দ্বারা নাক পরিষ্কার করবে না।

৬৭। সূর্য উদয়ের পূর্বেই শয্যা ত্যাগ করবে।

৬৮। পথ চলার সময় বড়দের আগে চলবে না।

৬৯। এদিক সেদিক উঁকি মেরে দেখবে না।

৭০। অন্যের কথার মধ্যে বাঁধা দিয়ে কথা বলবে না।

৭১। মেহমানের সামনে কারো প্রতি রাগান্বিত হয়ো না।

৭২। সন্দেহ প্রবণতা ত্যাগ করতে না পারলে দুনিয়ায় তুমি কোনো বন্ধু

খুঁজে পাবে না।

৭৩। বেটা! তুমি এত মিষ্ট হয়ো না যে,মানুষ তোমাকে গিলে ফেলে। আর এতো তিক্তও হয়ো না যে, মানুষ তোমাকে থুথুর মতো ফেলে দেয়।

৭৪। বেটা! নিজের খানা আল্লাহভীরু লোকদের ব্যতীত কাউকে খাওয়াবে না। আর নিজ কাজের জন্য আলেমগণের নিকট হতে পরামর্শ নিতে থাকবে।

৭৫। বেটা! মূর্খের সাথে বন্ধুত্ব করো না। এমন যেন না হয় যে, তার মূর্খতাসুলভ কথাবার্তা তোমার ভালো লাগতে আরম্ভ করে।আর জ্ঞানী লোকের সহিত শত্রুতা করো না।এমন যেন না হয় যে,সে তোমার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে রাখে।

৭৬। বেটা! তুমি সেদিন থেকে প্রতিনিয়ত আখেরাতের দিকে ধাবিত হচ্ছো, যেদিন তোমার দুনিয়াতে আগমন ঘটেছে। লোকমান হেকিমের উপদেশাবলী।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে উক্ত নাসিহাগুলোর উপর আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন!

হাত্বান ইবনু মুয়াল্লার নাসিহা

হাত্বান ইবনু মুয়াল্লা নিজ ছেলেদেরকে নাসিহাহ করেছিলেন। এখানে তার সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হলো।

১. বেটা! আল্লাহকে ভয় করে চলবে। তার আনুগত্যকে নিজের উপর আবশ্যক করে নাও।

২. সুন্নাতের অনুসরণ কর। নিষিদ্ধ করজ থেকে বিরত থাকো। যেন তোমার জীবন সুন্দর হয় এবং চক্ষু শীতল হয়।

৩. আল্লাহ তাআলার কাছে কোন জিনিস গোপন নেই। আমি তোমাকে কয়েকটি বিষয়ের আদেশ করছি। তুমি যদি সেগুলো বুঝে আমল

করো, তোমার জীবন সুখময় হবে।

৪. নিজ পিতার আনুগত্য কর। তার দেয়া উপদেশের উপর আমল করো।

৫. অনর্থক কথা-বার্তা বলা থেকে বিরত থাকো।

৬. অতিরিক্ত হাসি বা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা এগুলো মানুষের গম্ভীরভাব নষ্ট করে দেয়। কৃপণতা সৃষ্টি করে।

৭. সব লেনদেনের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বণ করবে। মধ্যমপন্থা হলো সর্বোত্তম পথ।

৮. কম কথা বলো।

৯. পরস্পরের মাঝে সালামের প্রথা চালু কর।

১০. নেক লোকদের সাদৃশ্যতা অবলম্বণ কর।

১১. অসৎ লোকদের সংশ্রব থেকে বেঁচে থাক। কেননা তারা নিজ বন্ধুর সাথে খেয়ানত করে।

১২. ভাই দুই ধরনের হয়ে থাকে। এক. যে বিপদের সময় তোমার পাশে থাকবে। দুই যে সুখের সময় তোমার বন্ধু হবে।

আবদুল মালিক ইবনু সালেহের নাসিহা

সন্তানদের সুন্দর পরিচর্যা বিষয়ক অত্যন্ত চমৎকার উপদেশ। যা আবদুল মালিক তার মৃত্যুর আগ মুহূর্তে নিজ সন্তানদেরকে করেছেন। তিনি বলেন,

১. প্রিয় সন্তান! হেলেম অর্থাৎ সহনশীলতার সাথে কাজ কর। কেননা সহনশীলতার কারণে মানুষ নেতা হয়ে যায়।

২. যে কথা ভালোভাবে বুঝবে শুধুমাত্র সেগুলোই প্রকাশ কর।

৩. নেককার লোকদের সাথে সাক্ষাত কর। কেননা নেককারদের সাথে সাক্ষাত অন্তরকে আবাদ করে দেয়।

৪. অন্তরের পরিশুদ্ধতা ও ভবিষ্যতের সুরক্ষা তোমাকে যেন ধোঁকায় না ফেলে। কেননা বয়স একেবারেই সীমিত আর অন্তরের পরিশুদ্ধাত মানুষের জীবনের পূর্নাঙ্গতা।

৫. যে নিজের প্রবৃত্তির পূজারী হয়, সে যেন নিজেকে দ্বীন ও দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়।

৬. সৎপথে সাহায্য করা আভিজাত্যের কারণ আর অসৎপথে খরচ করা নির্বুদ্ধিতা।

৭. অনর্থক কথা-বার্তা থেকে বেঁচে থাক। কেননা এর দ্বারা তোমার সন্তর্পিত দোষ প্রকাশ পেয়ে যাবে এবং তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর মত পূঁজি শত্রুর অর্জন হয়ে যাবে।

৮. প্রতিটি মানুষকে তার কথার দ্বারা চেনা যায়। আর সে তার কাজের দ্বারা গুণান্বিত হয়। কাজেই তুমি যথাসম্ভব চুপ থাক। কেননা এটা সুরক্ষা থাকার মাধ্যম। আর সত্য বলো, কেননা উহা সম্মান ও মর্য়াদার কারণ।

৯. যে তার সমসাময়িক ব্যক্তিকে অপমান করে, সে কখনো সম্মানিত ব্যক্তি হতে পারে না।

১০. যে তার ভাই থেকে পৃথক থাকে, সে কখনো সৌভাগ্যবান হতে পারে না।

১১. যখন তুমি কোন নেক কাজ কর, গোপনে কর, প্রকাশ করো না। আর যে ব্যক্তি তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করে তুমি তা প্রকাশ করে দাও।

১২. অজ্ঞ লোকদের কথার জবাব দিও না। আবার তার কাজের কারণে তাকে পাকড়াও করো না।

১৩. জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হলো, সে অজ্ঞ লোকের সাথে এমনভাবে কথা বলবে যেমন ডাক্তার রোগীর সাথে কথা বলে।

১৪. অমূলক বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা এর দ্বারা তোমার সম্মান কমে যাবে। তোমার কথার কোন মূল্য থাকবে না।

১৫. সবচেয়ে অসৎ সম্পদ হলো যা খরচ করা হয়। সবচেয়ে অসৎ ভাই হলো যে অন্যের উপকার করে না।

১৬. তোমার যখন কারো সাথে অসৎ আচরণ হয়ে যায়, সাথে সাথে ওযুহাত উল্লেখ কর। সম্ভব হলে ক্ষমা চাও। আর ক্ষমা চাওয়ার দ্বারা মানুষের মর্যাদায় কোন ঘাটতি আসে না, ব্যক্তি যত বড় মর্যাদার অধিকারিই হোক না কেন। কেননা সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক সব সময় অন্যকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকে।

১৭. যে সম্পদ দান করে, সে মহান ব্যক্তি হয়।

১৯. যে নিজের ইজ্জত-আব্রু ভূলুণ্ঠিত করে সে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়।

২০. নেক আমল বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করে।

২১. নীরবতার দ্বারা নিরাপদে থাকা যায়।

২২. প্রশ্ন কম করলে সম্মান-মর্যাদা লাভ হয়।

২৩. বেকুব লোকদের সংশ্রব থেকে বেঁচে থাক। অন্যথায় তুমিও বেকুব হয়ে যাবে।

২৪. বেটা! অন্তর হলো ক্ষেত স্বরূপ। তুমি তাতে কালিমার বীজ রোপন কর। কেননা এই ক্ষেত যদি তুমি প্রশস্ত না কর তাহলে তা এমনিতেই প্রশস্ত হয়ে যাবে।

২৫. ভালোভাবে জেনে নাও। মানুষকে সম্মান করা হয় তার বিচক্ষণতা ও শিক্ষা-দীক্ষার কারণেই। সম্পদ ও বংশ সম্মানের কারণে নয়।

২৬. শ্রেষ্ঠত্ব ইলম ও হেকমতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। শুধু আগ্রহ ও চাহিদার মধ্যে নয়।

২৭. যার গোড়ায় অনিষ্টতা রয়েছে, তার কাজে-কর্মেও অনিষ্টতা থাকবে। ক্রোধ থেকে বেঁচে থাকা। কেননা তা মানুষের মনোবলকে দুর্বল করে দেয় এবং ঝগড়াকে বেগবান করে দেয়।

২৮. যখন তোমার কারো সাথে ঝগড়া বা বিতর্ক বেঁধে যায় তখন

রাগের সাথে কাজ করো না। কেননা রাগ তোমার শক্তিকে দুর্বল করে দিবে এবং তোমার দলিলকে বাতিল করে দিবে।

২৯. অন্তরের আঘাত কখনো শুকায় না।

৩০. প্রেমের স্ফুলিঙ্গ কখনো নিষ্প্রভ হয় না।

৩১. হিংসা ও প্রতিহিংসার আগুণ নির্বাপিত হয় না।

৩২. কখনো শত্রুর চোখ স্পর্শ করো না।

৩৩. সাত শ্রেণীর লোক থেকে কখনোই পরামর্শ নিবে না। জাহেল, শত্রু, হিংসুক, রিয়াকারী, ভীতু, কৃপণ ও আত্মপূজারী।

৩৪. যখন কোন কাজ তোমার সামনে আসে, তুমি তা নিজের শত্রু কিংবা মিত্র, কারো কাছেই বলবে না।

৩৫. কেউ যখন তোমার কাছে এস ওজুহাত উল্লেখ করে তোমার উচিত তার ওজুহাত গ্রহণ করা। যদিও সে অজুহাত উল্লেখ করার ক্ষেত্রে মিথ্যা বলে।

৩৬. যে আত্মপছন্দী হয়, সে গোমরাহ হয়ে যায়।

৩৭. যে নিজের বিবেকের কাছে প্রতারিত হয় সে লাঞ্ছিত হয়।

৩৮. যে সবার সাথেই মিলেমিশে চলে সে তুচ্ছ হয়ে যায়।

৩৯. যে অসৎ কাজের মধ্যে পড়ে যায় সে অপবাদের শিকার হয়।

৪০. সৌভাগ্যবান হলো ঐ ব্যক্তি যে অন্যের উপদেশ গ্রহণ করে।

আবদুল মালিক ইবনু সালেহ এ উপদেশগুলো বলার পর শেষে বলেন, আমি তোমার সামনে উপদেশ স্পষ্ট করে দিয়েছি। এবার তোমার কাজ হলো আমল করা। আমল করে হেদায়েত অর্জন করে নাও।

স্বীয় সন্তানের প্রতি একজন পিতার উপদেশ

প্রিয় সন্তান!

আমি তোমাকে তিনটি কারণে এই কথাগুলো বলছি সারা জীবন মনে রাখার চেষ্টা করবে।

১। জীবন, ভাগ্য এবং দুর্ঘটনার কোন নিশ্চয়তা নেই। কেউ জানে না সে কতদিন বাঁচবে!

২। আমি তোমার বাবা, যদি আমি তোমাকে এই কথা না বলি, অন্য কেউ বলবে না।

৩। যা লিখলাম; তা আমার নিজের ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতা- এটা হয়তো তোমাকে অনেক অপ্রয়োজনীয় কষ্ট পাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে।

জীবনে চলার পথে এগুলো মনে রাখার চেষ্টা করবে

১। যারা তোমার প্রতি সদয় ছিল না, তাঁদের উপর অসন্তোষ পুষে রেখো না। কারণ, তোমার মা এবং আমি ছাড়া তোমার প্রতি সুবিচার করা কারো দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। আর যারা তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করেছে, তোমার উচিত সেটার সঠিক মূল্যায়ন করা এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা। তবে তোমার সতর্ক থাকতে হবে। এজন্য যে, প্রতিটি মানুষেরই প্রতি পদক্ষেপের নিজ নিজ উদ্দেশ্য থাকতে পারে। একজন মানুষ আজ তোমার সাথে ভালো। তার মানে এই নয় যে, সে সবসময়ই ভালো থাকবে। তাই খুব দ্রুত কাউকে প্রকৃত বন্ধু ভেবো না।

২। জীবনে কিছুই কিংবা কেউই 'অপরিহার্য' নয়, যা তোমার পেতেই হবে। একবার যখন তুমি এ কথাটির গভীরতা অনুধাবন করবে, তখন জীবনের পথচলা অনেক সহজ হবে। বিশেষ করে যখন বহুল প্রত্যাশিত কিছু হারাবে, কিংবা তোমার তথাকথিত আত্মীয়-স্বজনকে তোমার পাশে পাবে না।

৩. জীবন সংক্ষিপ্ত।

আজ তুমি জীবনকে অবহেলা করলে, কাল জীবন তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে। কাজেই জীবনকে তুমি যত তাড়াতাড়ি মূল্যায়ন করতে শিখবে, ততোই বেশী উপভোগ করতে পারবে।

৪. ভালবাসা একটি ক্ষণস্থায়ী অনুভূতি ছাড়া কিছুই নয়। মানুষের মেজাজ আর সময়ের সাথে সাথে এই অনুভূতি বিবর্ণ হবে। যদি তোমার তথাকথিত কাছের মানুষ তোমাকে ছেড়ে চলে যায়, ধৈর্য ধরো। সময় তোমার সব ব্যাথা-বিষণ্নতায়কে ধুয়ে-মুছে দেবে। কখনো প্রেম-ভালবাসার মিষ্টতা এবং সৌন্দর্যকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না। আবার ভালবাসা হারিয়ে বিষণ্নতায়ও অতিরঞ্জিত হবে না।

৫. অনেক সফল লোক আছেন যাদের হয়তো উচ্চশিক্ষা ছিল না। এর অর্থ এই নয় যে, তুমিও কঠোর পরিশ্রম বা শিক্ষালাভ ছাড়াই সফল হতে পারবে! তুমি যতটুকু জ্ঞানই অর্জন করোনা কেন, ততটুকুই হলো তোমার জীবনের অস্ত্র। কেউ ছেঁড়া কাঁথা থেকে লাখ টাকার অধিকারী হতেই পারে, তবে এজন্য তাকে অবশ্যই কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

৬. আমি আশা করি না যে, আমার বার্ধক্যে তুমি আমাকে আর্থিক সহায়তা দিবে। আবার আমিও তোমার সারাজীবন ধরে তোমাকে অর্থ সহায়তা দিয়ে যাবো না। যখনি তুমি প্রাপ্তবয়স্ক হবে, তখনই বাবা হিসেবে আমার অর্থ-সহায়তা দেয়ার দিন শেষ। তারপর, তোমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে- তুমি কি পাবলিক পরিবহনে যাতায়াত করবে, নাকি নিজস্ব বিলাসবহুল গাড়ি হাঁকাবে? গরীব থাকবে নাকি ধনী হবে?।

৭. তুমি তোমার কথার মর্যাদা রাখবে। কিন্তু অন্যদের কাছে তা আশা করবে না। মানুষের সাথে ভালো আচরণ করবে। তবে অন্যরাও তোমার সাথে ভালো আচরণ করবে। তা প্রত্যাশা করবে না। যদি তুমি এটি না বুঝতে পারো, তবে শুধু অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রণাই পাবে।

৮. আমি অনেক বছর ধরে লটারি কিনেছি। তবে কখনো কোন পুরষ্কার পাইনি। তার মানে হলো এই যে, যদি তুমি সমৃদ্ধি চাও, তবে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। বিনামূল্যে কোথাও কিছু জুটবে না।

৯. তোমার সাথে আমি কতটা সময় থাকবো- সেটা কোন ব্যাপার না। বরং চলো, আমরা আমাদের একসাথে কাটানো মুহূর্তগুলো উপভোগ করি। মূল্যায়ন করি।

সমাপ্ত

আমরা প্রায়শই বলে থাকি, "আজকের শিশু আগামীর ভবিষ্যত"। আসলে আমরা খুব সহজে এই কথাটি বলে থাকি। তবে এর বাস্তবতা অনেকটাই কঠিন। আমরা আমাদের শিশুদেরকে ভবিষ্যতের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য কতটুকু চেষ্টা করেছি? কয়টা পরিবার-ই বা আছে, যে তারা শিশুদেরকে আগামীর উপযোগী করে গড়ে তুলতে সঠিক পন্থায় পরিচর্যা করছে?

খোঁজ করলে দেখা যাবে এর সংখ্যা খুবই কম। একেবারেই নগণ্য। আমরা আমাদের ক্ষেত-খামার বা গাছ-পালা যতটা গুরুত্বের সাথে পরিচর্যা করি; আমাদের সন্তানদেরকে এর এক সিকিভাগও পরিচর্যা করি না। যার ফলে সন্তান ছোট থেকেই অবহেলা আর অনাদরে বেড়ে ওঠে। অভদ্রতার জীবন যাপন করে।

আদর্শ পিতা-মাতা সুসন্তান গড়ে তোলার পিছনে অনেক বড় ভূমিকা রাখে। কারণ, আদর্শ পিতা-মাতার সঙ্গ সন্তানের হৃদয়-ক্ষেতে পানি সিঞ্চনের কাজ করে। আদর্শ সন্তান গড়ে তুলতে হলে ইসলামিক দিকনির্দেশনা অনুসরণ করা ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। তার অভ্যাসগুলোকে নববী আদর্শে রূপায়ন করতে হবে। ছোট থেকেই তাকে সুশিক্ষায় মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। পরিশুদ্ধ চিন্তার বীজ তার মধ্যে বপন করতে হবে। কারণ, সুস্থ চিন্তা মানসিক চেতনার বিকাশ ঘটায়। জীবন গড়ার উদ্দম-উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা জোগায়। আমরা যদি আমাদের সন্তানদেরকে ভ্রূণ থেকেই সঠিক পন্থায় পরিচর্যা করি, এই সন্তানই একদিন সুবাসিত ফুল হয়ে জগদ্বাসীকে মোহিত করবে।

978-984-95998-2-1

Ferdous Mikdad • 01303743742